মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
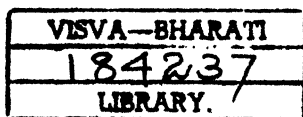
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষপূর্তি-স্মরণ-গ্রন্থ

প্রকাশ ৭ই পৌষ ১৩৭৫ : ১৮৯০ শক

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম : ৩ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১২২৪ । ১৫ মে ১৮১৭

মৃত্যু : ৬ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩১১ । ১৯ জানুয়ারি ১৯০৫

সংকলয়িতা

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষপূর্তি (৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪) উপলক্ষে বিশ্বভারতী যে কৃত্যসূচী গ্রহণ করেন, বিভিন্ন গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত মহর্ষিদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর একত্র সংকলন তাহার অন্যতম।

বাল্যে পিতৃদেবের সহিত হিমালয়বাসের কথা স্মরণ করিয়া পরবর্তী-কালে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখেছি, আর হিমালয় পর্বতকে। উভয়ের মধ্যেই ভাবের মিল ছিল। হিমালয়ে এমন একটি চিরন্তন রূপ যা সমগ্র ভারতের— যা এক দিকে দুর্গম, আর-এক দিকে সর্বজনীন। আমার পিতার মধ্যেও ভারতের সেই বিদ্যা চিন্তায় পূজায় কর্মে প্রত্যহ প্রাণময় হয়ে দেখা যাচ্ছিল যা সর্বকালীন, যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কার্পণ্যমাত্র নেই।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও চরিত্রের এই সর্বকালীনতা রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন মহর্ষির জন্মোৎসব ও মৃত্যু-সাংবৎসরিক দিবসে নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায়, মহর্ষির দীক্ষাদিবসে কথিত ভাষণে, জীবনস্মৃতিতে ও কবিতায়; এই গ্রন্থে সেগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ হইতে যথাসাধ্য সংকলন করিবার প্রযত্ন করা হইয়াছে।

সূচনায় 'নৈবেদ্য'র যে-কবিতাটি ('ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন-সমর্পণ') মুদ্রিত তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশে রচিত এবং মহর্ষির অষ্টাশীতিতম জন্মোৎসবে গীত হইয়াছিল, সুর ইমন ভূপালী, তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা (আষাঢ় ১৮২৬ শক, পৃ ৪৪) হইতে এরূপ জানা যায়।

গ্রন্থমধ্যে মুদ্রিত গীতাঞ্জলির 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ' (১৭ পৌষ ১৩১৬) গানটি ১৩১৬ সালের ৬ মাঘ মহর্ষিদেবের বাটীর প্রাঙ্গণে তাঁহার বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে গীত হইয়াছিল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে (ফাল্গুন ১৮৩১ শক, পৃ ১৭৮) এইরূপ উল্লেখ আছে।

অধ্যায়সূচী

চিত্রসূচী

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ—
ওরে দীন, তুই জোড়কর করি
কর্ তাহা দরশন!
মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি,
বহিয়া যেতেছে অমৃতলহরী,
ভূতলে মাথাটি রাখিয়া লহো রে
শুভাশিস্-বরিষন।
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ!

ওই যে আলোক পড়েছে তাঁহার
উদার ললাটদেশে,
সেথা হতে তারি একটি রশ্মি
পড়ুক মাথায় এসে!
চারি দিকে তাঁর শান্তিসাগর
স্থির হয়ে আছে ভরি চরাচর,
ক্ষণকাল-তরে দাঁড়াও রে তীরে,
শান্ত করো রে মন!
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ!

জন্মদিনে ও মৃত্যুদিনে কথিত / পঠিত

মহর্ষিদেবের জন্মোৎসবে এবং তাঁহার লোকান্তরগমনের পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ও মৃত্যুবার্ষিক দিবসে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল প্রবন্ধ পাঠ করেন বা বক্তৃতা দেন তাহা এই বিভাগে সংকলিত হইয়াছে।

পূজনীয় পিতৃদেবের আজ অষ্টাশীতিতম সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব। এই উৎসবদিনের পবিত্রতা আমরা বিশেষভাবে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব।

বহুতর দেশকে সঞ্জীবনস্পর্শে উর্বর করিয়া, পুণ্যধারায় বহুতর গ্রাম-নগরীর পিপাসা মিটাইয়া, অবশেষে জাহ্নবী যেখানে মহাসমুদ্রের প্রত্যক্ষসম্মুখে আপন সুদীর্ঘ পর্যটন অতলস্পর্শ শান্তির মধ্যে সমাপ্ত করিতে উদ্যত হয়, সেই সাগরসংগমস্থল তীর্থস্থান। পিতৃদেবের পূতজীবন অদ্য আমাদের সম্মুখে সেই তীর্থস্থান অবারিত করিয়াছে। তাঁহার পুণ্য-কর্মরত দীর্ঘজীবনের একাগ্রধারা অদ্য যেখানে তটহীন সীমাশূন্য বিপুল বিরামসমুদ্রের সম্মুখীন হইয়াছে সেইখানে আমরা ক্ষণকালের জন্য নত-শিরে স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইব। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিব, বহুকাল পূর্বে একদিন স্বর্গ হইতে কোন্ শুভ সূর্যকিরণের আঘাতে অকস্মাৎ সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া কঠিন তুষারবেষ্টনকে অশ্রুধারায় বিগলিত করিয়া এই জীবন আপন কল্যাণযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল— তখন ইহার ক্ষীণ স্বচ্ছ ধারা কখনো আলোক কখনো অন্ধকার— কখনো আশা কখনো নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া দুর্গম পথ কাটিয়া কাটিয়া চলিতেছিল। বাধা প্রতিদিন বৃহদাকার হইয়া দেখা দিতে লাগিল— কঠিন প্রস্তরপিণ্ডসকল পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল— কিন্তু সে-সকল বাধায় স্রোতকে রুদ্ধ না করিতে পারিয়া দ্বিগুণবেগে উদ্‌বেল করিয়া তুলিল— দুঃসাধ্য দুর্গমতা সেই দুর্বার বলের নিকট মস্তক নত করিয়া দিল। এই জীবনধারা ক্রমশ বৃহৎ হইয়া, বিস্তৃত হইয়া, লোকালয়ের মধ্যে অবতরণ করিল ; দুই কূলকে নবজীবনে অভিষিক্ত করিয়া চলিল ; বাধা মানিল না, বিশ্রাম করিল না, কিছুতেই তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল না— অবশেষে আজ সেই

একনিষ্ঠ অনন্যপরায়ণ জীবনস্রোত সংসারের দুই কূলকে আচ্ছন্ন করিয়া, অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে— আজ সে তাহার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চাঞ্চল্যকে পরমপরিণামের সম্মুখে প্রশান্ত করিয়া পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের দিকে আপনাকে প্রসারিত করিয়াছে— অনন্ত জীবনসমুদ্রের সহিত সার্থক জীবনধারার এই সুগম্ভীর সম্মিলনদৃশ্য অদ্য আমাদের ধ্যাননেত্রের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করুক।

অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য একটি প্রধান অন্তরায়। সামান্য সোনার প্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অনন্ত আকাশের অমৃত-আলোককে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ধনসম্পদের মধ্যেই দীনহৃদয় আপনার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে থাকে— সে বলে, এই তো আমি কৃতার্থ হইয়াছি, দশে আমার স্তব করিতেছে, দেশে আমার প্রতাপ বিকীর্ণ হইতেছে, বাহিরে আমার আড়ম্বর অভ্রভেদ করিতেছে, ঘরে আমার আরামশয়ন প্রতিদিন স্তরে স্তরে রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে, আমার আর কী চাই। হায় রে দরিদ্র, নিখিল মানবের অন্তরাত্মা যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে— যাহাতে আমি অমর না হইব তাহা লইয়া আমি কী করিব— 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্' —সপ্তলোক যখন অন্তরীক্ষে ঊর্ধ্বকররাজি প্রসারিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, আমাকে সত্য দাও, আলোক দাও, অমৃত দাও, 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়'— তখন তুমি বলিতেছ আমার ধন আছে, আমার মান আছে, আমার আরাম আছে, আমি প্রভু, আমি অধিপতি, আমার আর কী চাই! ঐশ্বর্যের ইহাই বিড়ম্বনা— দীনাত্মার কাছে ঐশ্বর্যই চরমসার্থকতার রূপ ধারণ করে। অদ্যকার উৎসবে আমরা যাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি— একদা প্রথম যৌবনেই তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টি এই কঠিন ঐশ্বর্যের

দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে উন্মীলিত হইয়াছিল— যখন তিনি ধনমানের দ্বারা নীরন্ধ্রভাবে আবৃত আচ্ছন্ন ছিলেন, তখনই ধনসম্পদের স্থূলতম আবরণ ভেদ করিয়া, স্তাবকগণের বন্দনাগানকে অধঃকৃত করিয়া, আরাম-আমোদ-আড়ম্বরের ঘন যবনিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া এই অমৃতবাণী তাঁহার কর্ণে কেমন করিয়া প্রবেশলাভ করিল যে 'ঈশা-বাস্যমিদং সর্বম্'— যাহা-কিছু সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিবে, ধনের দ্বারা নহে, স্বার্থের দ্বারা নহে, আত্মাভিমানের দ্বারা নহে— যিনি 'ঈশানং ভূতভব্যস্য', যিনি আমাদের অনন্তকালের ঈশ্বর, আমাদের ভূতভবিষ্যতের প্রভু, তাঁহাকে এই ধনিসন্তান কেমন করিয়া মুহূর্তের মধ্যে ঐশ্বর্যপ্রভাবের ঊর্ধ্বে, সমস্ত প্রভুত্বের উচ্চে আপনার একমাত্র প্রভু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন— সংসারের মধ্যে তাঁহার নিজের প্রভুত্ব, সমাজের মধ্যে তাঁহার ধনমর্যাদার সম্মান, তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না।

আবার যেদিন এই প্রভূত ঐশ্বর্য অকস্মাৎ এক দুর্দিনের বজ্রাঘাতে বিপুল আয়োজন আড়ম্বর লইয়া তাঁহার চতুর্দিকে সশব্দে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল— ঋণ যখন উপন্যাসের দানবের ন্যায় মুহূর্তের মধ্যেই বৃহদাকার ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহদ্বার, তাঁহার সুখসমৃদ্ধি, তাঁহার অশনবসন, সমস্তই গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিল— তখনো পদ্ম যেমন আপন মৃণালবৃন্ত দীর্ঘতর করিয়া জলপ্লাবনের ঊর্ধ্বে আপনাকে সূর্যকিরণের দিকে নির্মল সৌন্দর্যে উন্মেষিত করিয়া রাখে, তেমনি করিয়া তিনি সমস্ত বিপদ্‌বন্যার ঊর্ধ্বে আপনার অম্লানহৃদয়কে ধ্রুবজ্যোতির দিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাখিলেন। সম্পদ যাঁহাকে অমৃতলাভ হইতে তিরস্কৃত করিতে পারে নাই, বিপদও তাঁহাকে অমৃতসঞ্চয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারিল না। সেই দুঃসময়কেই তিনি আত্মজ্যোতির দ্বারা সুসময় করিয়া

তুলিয়াছিলেন— যখন তাঁহার ধনসম্পদ ধূলিশায়ী তখনই তিনি তাঁহার দৈন্যের ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান হইয়া পরমাত্মসম্পদবিতরণের উপলক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষকে মুহুর্মুহু আহ্বান করিতেছিলেন। সম্পদের দিনে তিনি ভুবনেশ্বরের দ্বারে রিক্তহস্তে ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বিপদের দিনে তিনি আত্মৈশ্বর্যের গৌরবে ব্রহ্মসত্র খুলিয়া বিশ্বপতির প্রসাদসুধাবণ্টনের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঐশ্বর্যের সুখশয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া ধর্ম ইঁহাকে তাহার পথের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিল— 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'— কবিরা বলেন, সেই পথ ক্ষুরধারনিশিত অতি দুর্গম পথ। লোকাচারপ্রচলিত চিরাভ্যস্ত ধর্ম, আরামের ধর্ম, তাহা অন্ধভাবে জড়-ভাবেও পালন করিয়া যাওয়া চলে এবং তাহা পালন করিয়া লোকের নিকট সহজেই যশোলাভ করিতে পারা যায়। ধর্মের সেই আরাম সেই সম্মানকেও পিতৃদেব পরিহার করিয়াছিলেন। ক্ষুরধারনিশিত দুরতি-ক্রম্য পথেই তিনি নির্ভয়ে পদনিক্ষেপ করিলেন। লোকসমাজের আনুগত্য করিতে গিয়া তিনি আত্মবিদ্রোহী আত্মঘাতী হইলেন না।

ধনিগৃহে যাঁহাদের জন্ম, পৈতৃককাল হইতেই সমাজের নিকট সম্মান-লাভে যাঁহারা অভ্যস্ত, সমাজপ্রচলিত সংস্কারের নিবিড়ব্যূহ ভেদ করিয়া নিজের অন্তর্লব্ধ সত্যের পতাকাকে শত্রুমিত্রের ধিক্‌কার লাঞ্ছনা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিচলিত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া রাখা তাঁহাদের পক্ষে কোনোমতেই সহজ নহে— বিশেষতঃ বৈষয়িক সংকটের সময় সকলের আনুকূল্য যখন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তখন তাহা যে কিরূপ কঠিন, সে কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেই তরুণবয়সে, বৈষয়িক দুর্যোগের দিনে, সম্ভ্রান্তসমাজে তাঁহার যে বংশগত প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পিতৃদেব ভারতবর্ষের ঋষিবন্দিত চিরন্তন

ব্রহ্মের, সেই অপ্রতিম দেবাধিদেবের আধ্যাত্মিক পূজা প্রতিকূল সমাজের নিকট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

তাহার পরে তাঁহার জীবনে আর-এক গুরুতর সংগ্রামের দিন উপস্থিত হইল। সকলেই জানেন, বৈচিত্র্যই জগতে ঐক্যকে প্রমাণ করে—বৈচিত্র্য যতই সুনির্দিষ্ট হয়, ঐক্য ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ধর্মও সেইরূপ নানা সমাজের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া, নানা বিভিন্ন কণ্ঠে নানা বিচিত্র আকারে এক নিত্যসত্যকে চারি দিক হইতে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষ বিশেষ সাধনায় বিশেষভাবে যাহা লাভ করিয়াছে তাহার ভারতবর্ষীয় আকার বিলুপ্ত করিয়া, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উৎপাটিত করিয়া, তাহাকে অন্যদেশীয় আকৃতি-প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে জগতের ঐক্যমূলক বৈচিত্র্যের ধর্মকে লঙ্ঘন করা হয়। প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকৃতি -অনুসারে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে তখনই সে মনুষ্যত্বলাভ করে—সাধারণ মনুষ্যত্ব ব্যক্তিগত বিশেষত্বের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যত্ব হিন্দুর মধ্যে এবং খৃস্টানের মধ্যে বস্তুত একই, কিন্তু তথাপি হিন্দু-বিশেষত্ব মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ সম্পদ, এবং খৃস্টান-বিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ লাভ—তাহার কোনোটা সম্পূর্ণ বর্জন করিলে মনুষ্যত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্বভৌমিক, য়ুরোপের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্বভৌমিক; কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষীয়তা এবং য়ুরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে বলিয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া চলে না। মেঘ আকাশ হইতে জলবর্ষণ করে এবং সরোবর ভূতলে থাকিয়া জলদান করে—যদিও দানের সামগ্রী একই, তথাপি এই পার্থক্যবশতই মেঘ আপন প্রকৃতি -অনুসারে বিশেষভাবে ধন্য এবং সরোবরও আপন প্রকৃতি -অনুসারে বিশেষভাবে কৃতার্থ। ইহারা উভয়ে এক হইয়া গেলে

জলের পরিমাণ মোটের উপরে কমে না, কিন্তু জগতে ক্ষতির কারণ ঘটে।

তরুণ ব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভুলিয়াছিল, যখন ধর্মের স্বদেশীয় রূপ রক্ষা করাকে সে সংকীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত, যখন সে মনে করিয়াছিল বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবর্ষীয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থভাবে ঔদার্যরক্ষা হয়, তখন পিতৃদেব সার্বভৌমিক ধর্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জন দিতে অস্বীকার করিলেন—ইহাতে তাঁহার অনুবর্তী অসামান্যপ্রতিভাশালী ধর্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। এই বিচ্ছেদ স্বীকার করিতে যে দৃঢ়তা, যে সাহস, যে বলের প্রয়োজন হয়, সমস্ত মতামতের কথা বিস্মৃত হইয়া আজ তাহাই যেন আমরা স্মরণ করি। আধুনিক হিন্দুসমাজের প্রচলিত লোকাচারের প্রবল প্রতিকূলতার মুখে আপন অনুবর্তী সমাজের ক্ষমতাশালী সহায়গণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে সকল দিক হইতেই রিক্ত করিতে কে পারে, যাঁহার অন্তঃকরণ জগতের আদিশক্তির অক্ষয় নির্ঝরধারায় অহরহ পূর্ণ হইয়া না উঠিতেছে।

ইঁহাকে যেমন আমরা সম্পদে-বিপদে অভয় আশ্রয়ে অবিচলিত দেখিয়াছি, তেমনি একবার বর্তমান সমাজের প্রতিকূলে, আর-একবার হিন্দুসমাজের অনুকূলে তাঁহাকে সত্যে বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিতে দেখিলাম—দেখিলাম, উপস্থিত গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। হিন্দুসমাজের মধ্যে তিনি পরম দুর্দিনেও একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে তিনি নব আশা নব উৎসাহের অভ্যুদয়ের মুখে পুনর্বার সমস্ত ত্যাগ করিয়া একাকী দাঁড়াইলেন। তাঁহার কেবল এই প্রার্থনা রহিল: 'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ'—আমি ব্রহ্মকে ত্যাগ

করিলাম না, ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ না করুন।

ধনসম্পদের স্বর্ণস্তূপরচিত ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া নবযৌবনের অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তির পরিবেষ্টনের মধ্যে দিব্যজ্যোতি যাঁহার ললাটস্পর্শ করিয়াছিল, ঘনীভূত বিপদের ভ্রূকুটিকুটিল রুদ্রচ্ছায়ায় আসন্ন দারিদ্র্যের উদ্যত বজ্রদণ্ডের সম্মুখেও ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখচ্ছবি যাঁহার অনিমেষ অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে অচঞ্চল ছিল, দুর্দিনের সময়েও সমস্ত লোকভয় অতিক্রম করিয়া যাঁহার কর্ণে ধর্মের 'মা ভৈঃ' বাণী সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলবৃদ্ধি দলপুষ্টির মুখে যিনি বিশ্বাসের বলে সমস্ত সহায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসংকোচে পরমসহায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহার পুণ্যচেষ্টাভূয়িষ্ঠ সুদীর্ঘ জীবনদিনের সায়াহ্নকাল সমাগত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার ক্লান্তকণ্ঠের স্বর ক্ষীণ, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণপ্রায় জীবনের নিঃশব্দবাণী সুস্পষ্টতর ; অদ্য তাঁহার ইহজীবনের কর্ম সমাপ্ত, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্মচেষ্টার মূলদেশ হইতে যে একাগ্রনিষ্ঠা ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়াছে তাহা আজ নিস্তব্ধভাবে প্রকাশমান। অদ্য তিনি তাঁহার এই বৃহৎ সংসারের বহির্দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ বিচ্ছেদ-মিলনের মধ্যে যে অচলা শান্তি জননীর আশীর্বাদের ন্যায় চিরদিন তাঁহার অন্তরে ধ্রুব হইয়া ছিল, তাহা দিনান্তকালের রমণীয় সূর্যাস্তচ্ছটার ন্যায় অদ্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উদ্‌ভাসিত। কর্মশালায় তিনি তাঁহার জীবনেশ্বরের আদেশপালন করিয়া, অদ্য বিরামশালায় তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরের সহিত নির্বাধমিলনের পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এই পুণ্যক্ষণে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য, তাঁহার সার্থকজীবনের শান্তিসৌন্দর্যমণ্ডিত শেষ রশ্মিচ্ছটা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য, এখানে সমাগত হইয়াছি।

বন্ধুগণ, যাঁহার জীবন আপনাদের জীবনশিখাকে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল করিয়াছে, যাঁহার বাণী অবসাদের সময় আপনাদিগকে বল ও বিষাদের

সময় আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছে, তাঁহার জন্মদিনকে উৎসবের দিন করিয়া আপনারা ভক্তিকে চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন— এইখানে আমি আমার পুত্রসম্বন্ধ লইয়া এই উৎসবদিনে যদি ক্ষণকালের জন্য পিতার নিকট বিশেষভাবে উপস্থিত হই, তবে আমাকে মার্জনা করিবেন। সন্নিকটবর্তী মহাত্মাকে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণভাবে দেখিবার অবসর আত্মীয়দের প্রায় ঘটে না। সংসারের সম্বন্ধ বিচিত্র সম্বন্ধ, বিচিত্র স্বার্থ, বিচিত্র মত, বিচিত্র প্রবৃত্তি— ইহার দ্বারা বিচারশক্তির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, ছোটো জিনিস বড়ো হইয়া উঠে, অনিত্য জিনিস নিত্য জিনিসকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকৃত পরিচয় প্রত্যহ খণ্ডিত হইয়া যায়। এইজন্যই পিতৃদেবের এই জন্মদিনের উৎসব তাঁহার আত্মীয়দের পক্ষে একটি বিশেষ শুভ অবসর। যে পরিমাণ দূরে দাঁড়াইলে মহত্ত্বকে আদ্যোপান্ত অখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্যকার এই উৎসবের সুযোগে বাহিরের ভক্তমণ্ডলীর সহিত একাসনে বসিয়া আমরা সেই পরিমাণ দূরে আসিব, তাঁহাকে ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত তুচ্ছ সম্বন্ধজাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিব, আমাদের সংকীর্ণ জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারোৎক্ষিপ্ত সমস্ত ধূলিরাশিকে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে বৃহৎ আকাশের মধ্যে, নির্মল শান্তির মধ্যে, দেবপ্রসাদের অক্ষুণ্ণ আনন্দরশ্মির মধ্যে, তাঁহার যথার্থ মহিমায় তাঁহাকে তাঁহার জীবনের নিত্যপ্রতিষ্ঠার উপরে সমাসীন দেখিব। সংসারের আবর্তে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যত বিদ্রোহ, যত চপলতা, যত অন্যায় করিয়াছি, অদ্য তাহার জন্য তাঁহার শ্রীচরণে একান্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিব— আজ তাঁহাকে আমাদের সংসারের, আমাদের সর্বপ্রয়োজনের অতীত করিয়া, তাঁহাকে বিশ্বভুবনের ও বিশ্বভুবনেশ্বরের সহিত বৃহৎ নিত্যসম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দেখিব এবং তাঁহার নিকট এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিব যে, যে চিরজীবনের ধনকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্চিত

করিয়াছেন সেই সঞ্চয়কেই যেন আমরা সর্বপ্রধান পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করি, তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত যেন আমাদিগকে ধনসম্পদের অন্ধতা হইতে রক্ষা করে, বিপদের বিভীষিকা হইতে উদ্ধার করে, বিশ্বাসের দৃঢ়তার মধ্যে আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখে এবং তিনি ঋষিদের যে মন্ত্র আমাদের কর্ণে ধ্বনিত করিয়াছেন তাহা যেন কোনো আরামের জড়ত্বে, কোনো নৈরাশ্যের অবসাদে বিস্মৃত না হই—

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ
অনিরাকরণমস্ত অনিরাকরণং মেঽস্তু।

বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, এই সপ্তাশীতিবর্ষীয় জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আনন্দিত হও, আশান্বিত হও। ইহা জানো যে, 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' ; ইহা জানো যে, ধর্মই ধর্মের সার্থকতা। ইহা জানো যে, আমরা যাহাকে সম্পদ বলিয়া উন্মত্ত হই তাহা সম্পদ নহে ; যাহাকে বিপদ বলিয়া ভীত হই তাহা বিপদ নহে ; আমাদের অন্তরাত্মা সম্পদ-বিপদের অতীত যে পরমা শান্তি তাহাকে আশ্রয় করিবার অধিকারী। 'ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'—সমস্ত জীবন দিয়া ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা করো, এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে ভূমাকেই সপ্রমাণ করো। এই প্রার্থনা করো 'আবিরাবীর্ম এধি'—হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। আমার নিকটে প্রকাশিত হইলে সেই প্রকাশ আমাকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত মানবের নিকট সহজে দীপ্যমান হইয়া উঠিবে—এইরূপে আমার জীবন সমস্ত মানবের নিত্য-জীবনের মধ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকিবে, আমার এই কয়দিনের মানবজন্ম চিরদিনের জন্য সার্থক হইবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

৩জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে পঠিত

অদ্য এই দেশের উপরে এই গৃহের উপরে মৃত্যুর অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে— দিক্ হইতে দিগন্তর শোকমেঘের কালিমায় আচ্ছন্ন— এই দুর্দিন দুর্যোগের মধ্যে এই অনাথপরিবার দুর্বলকম্পিত হস্তে ব্রহ্মোৎসবের পুণ্যদীপখানি আজ পুনরায় উত্থিত করিয়া ধরিল। এই উৎসবের আনন্দশিখা যিনি উজ্জ্বল করিয়া জ্বালাইয়াছিলেন, যিনি ইহাকে এই গৃহের মধ্যে চিরদিনের জন্য স্থাপন করিয়া গেছেন— তিনি তাঁহার মহৎজীবনের সমস্ত কর্ম দেবোৎসৃষ্ট নির্মাল্যের ন্যায় চিরন্তন আশীর্বচনের ন্যায় আমাদের জন্য রাখিয়া এখানকার কর্মলোক হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন— তিনি এখন সেই বিশ্বান্তরাত্মা পরম এককের সম্মুখে একাকী সমাসীন— আমরা অদ্য নতশিরে তাঁহার সেই স্বহস্তজ্বালিত অনির্বাণ মঙ্গলদীপ এই গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে আনয়ন করিলাম।

আজ বাহিরের সমারোহ নাই, আজ বাহিরের আলোকমালা ম্লান ও বিরল— আজ এই গৃহস্থপরিবার সমবেত উপাসকবর্গ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া শোকনিয়ম পালন করিতেছেন— কিন্তু বন্ধুগণ, অধ্যাত্মদৃষ্টি মেলিয়া দেখো, যিনি এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহার জ্যোতি আজ এই শোকান্ধকারের মধ্যে, স্বল্পসমারোহের মধ্যে, সমুজ্জ্বল হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। আজ কোনো উজ্জ্বলদৃশ্যে আমাদের দৃষ্টি মুগ্ধ করিতেছে না, —আজ কোনো উদ্দাম চিন্তায় আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে না —আজ মৃত্যু আমাদের সমস্ত ভাবনাকে আকর্ষণ করিয়া সেই বিরামদাত্রী বিশ্বধাত্রী জগজ্জননীর অন্তঃপুরের দ্বারসম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে; —যেখানে তিনি তাঁহার ভক্তসন্তানকে কর্মের ক্লান্তি শরীরের গ্লানি, সংসারের ধূলি হইতে সদ্যবিমুক্ত করিয়া ক্রোড়ের মধ্যে গ্রহণ

করিয়াছেন।

আজ আর বহুতর দীপমালার প্রয়োজন নাই— আজ সংসারের পরপার হইতে একটি আলোকচ্ছটা প্রতিফলিত হইয়া মানবজীবনের অস্তাচলশিখরকে অপরূপ মাহাত্ম্যে মণ্ডিত করিয়াছে— সেই আলোকই আজ আমাদের উৎসবের আলোক।

যে মহাপুরুষ পাঁচ দিন পূর্বে লোকান্তরে যাত্রা করিলেন, তিনি জীবিত-কালে এই ব্রহ্মোৎসবে বর্ষে বর্ষে আমাদিগকে উর্ধ্বস্বরে আহ্বান করিয়াছেন, বলিয়াছেন— 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' —তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, মুক্তির আর কোনো উপায় নাই। তখন আমরা সকলে তাঁহার আহ্বানে সমান কর্ণপাত করি নাই— আমরা এখানে লঘুচিত্তে আসিয়াছি, চক্ষুকর্ণের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছি, আনন্দের ঔদার্যকে ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে পরিণত হইতে দেখিয়াছি। আজ সেই মহাত্মা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অন্ধকারের পরপার হইতে আমাদিগকে অদ্যকার এই উৎসবে আহ্বান করিতেছেন— আজ এই ক্ষুদ্র গৃহের মধ্য হইতে তিনি আমাদিগকে ডাকিতেছেন না— সমস্ত আকাশের মধ্য হইতে আজ তাঁহার উচ্চারিত এই বাণী আমরা শুনিতেছি—

যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

'অমৃত যাঁহার ছায়া— যাঁহার ছায়া মৃত্যু— তিনি ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে আমরা পূজা করিব?'

আমরা জীবনকে ও মৃত্যুকে খণ্ডিত করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখি— সেইজন্য জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে আমরা একটা বিভীষিকার ব্যবধান গড়িয়া তুলি। কিন্তু, জীবন যাঁহার, মৃত্যুও তাঁহারই প্রসাদ, এই কথা অদ্য বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া সেই জীবন ও মৃত্যুর অধীশ্বরকে আমরা

পূজা করিব। 'যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ' তিনি জীবন ও মৃত্যুকে ঐক্যদান করিয়াছেন, এই কথা স্মরণ করিয়া আমরা জীবনকে সংযত করিব ও মৃত্যুকে ভয়শোক হইতে মুক্ত করিব। 'যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ' তাঁহার সহিত জীবনে মৃত্যুতে কোনো অবস্থাতেই আমাদের বিচ্ছেদ নাই, এই কথা স্মরণ করিয়া অদ্য মৃত্যুশোকের দিনেও সেই মৃত্যুরাজের উৎসবে আমরা পরিপূর্ণহৃদয়ে যোগদান করিব।

যিনি এই গৃহের স্বামী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে এই গৃহের কর্মপ্রবাহ সহসা স্তব্ধ হইতে পারে, সংসারযাত্রায় সমস্ত রথচক্র সহসা অবরুদ্ধ হইতে পারে, পরিজনবর্গের উৎসাহ উল্লাস সহসা ম্লান হইতে পারে— কিন্তু এই গৃহস্বামী যাঁহাকে তাঁহার চিরজীবনের স্বামী বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার উৎসব তো লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। লোকান্তরিত আত্মার সহিত তাঁহার চিরসম্বন্ধের তিলমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই, এই বন্ধুজনপরিবৃত গৃহকে তিনি মুহূর্তকালের জন্যও পরিত্যাগ করেন নাই। চন্দ্রমা শুভ্রকিরণে রাত্রিকে অভিষিক্ত করিতেছে, আকাশ চিরন্তন নক্ষত্রমালায় খচিত হইয়া আছে, নিত্যসমীরিত বায়ু ক্ষুদ্রতম কীটাণুকেও জীবনদানে কৃপণতা করিতেছে না ; ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে পূর্ণশক্তি বিচিত্রভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। কিছুতেই কোথাও ইঁহার কোনো খর্বতা নাই। 'যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ' তাঁহার মহোৎসবকে মৃত্যু কেমন করিয়া ম্লান করিবে— মৃত্যু যে তাঁহারই।

স্বর্গগত মহাপুরুষের জীবনের মধ্য দিয়া যে মঙ্গলশক্তিকে তিনি পৃথিবীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, উক্ত মহাপুরুষের মৃত্যুতে কি সেই শক্তি এই জগৎ হইতে হ্রাস হইয়া গেল? যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, তাহার কণামাত্র কি হারাইয়াছে? যাহা সত্য তাহার তিলমাত্র কি লুপ্ত হইয়াছে? কখনোই নহে। আজ একবার নিখিলের দিকে চাও এবং

অনুভব করো— সমস্তই আছে, কিছুই ভ্রষ্ট হয় নাই। আমরা জীবনে যাঁহাকে পাইয়াছিলাম, মৃত্যুতেও তিনি নবতরভাবে আমাদেরই আছেন। তাঁহার সাধনা তাঁহার সফলতা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করে নাই ; তাহা চিরকাল আমাদের সাধনা আমাদের সফলতারূপে বর্তমান রহিবে। তাঁহার সমস্ত জীবন আমাদের মধ্যে বিচিত্রভাবে ফলিত হইতে থাকিবে।

ঈশ্বরের মঙ্গলশক্তি সর্বত্রই বিশ্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই শক্তিই আকাশ জল বায়ু অগ্নি চন্দ্র সূর্য -রূপে নিয়তই আমাদিগকে ধারণ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তথাপি তাহার মধ্য হইতে সেই প্রত্যক্ষ মঙ্গলকে আমরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি না— কিন্তু যখন সেই শক্তি কোনো মানুষের জীবনের মধ্যে অসামান্য পুণ্যমহিমা ধারণপূর্বক সমস্ত ভয়লোভ-স্বার্থের উর্ধ্বে উত্তুঙ্গ হইয়া আপনাকে প্রকাশ করে তখনই তাহা মানুষের ধন হইয়া যায়— যে মঙ্গলকে সংশয়বুদ্ধিদ্বারা আমরা নিখিল জলস্থল আকাশের মধ্যে দেখিতে পাই না, সেই মঙ্গলকে মানুষের মধ্যে মহাপুরুষের মধ্যে আমরা নতমস্তকে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। বিশ্বের যে দিকে তাকাই, সর্বত্রই অমৃত সর্বত্রই আনন্দ— কিন্তু সেই অমৃত গ্রহণ করিবার, পান করিবার পাত্র আমরা নিজের মধ্যে পাই না— মহাপুরুষের মহৎ জীবন সেই বিশ্বব্যাপী অমৃত— বিশ্বব্যাপী আনন্দকে মানুষের গ্রহণের যোগ্য করিয়া চিরদিনের জন্য রক্ষা করে।

কয়েকদিন পূর্বে এই গৃহ হইতে যিনি বিশ্বগৃহে গমন করিয়াছেন, তিনি অমৃতকে আপনার জীবনের মধ্যে ধারণ করিয়া সেই জীবন আমাদের সকলকে দান করিয়া গেছেন। তাঁহার জীবনের মধ্যে দীর্ঘ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মের যে অগ্নি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা আমাদের অধিকারে আসিয়াছে। ঈশ্বরকে সেই মহাপুরুষের মধ্য দিয়া আমরা কিভাবে লাভ

করিলাম, অদ্যকার উৎসবে তাহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব। জগতের সমস্ত মহাত্মগণ মানুষকে মুক্তির দিকে লইয়া যান, ইঁহার জীবন আমাদিগকে সেই মুক্তির পথে কোথায় আকর্ষণ করিয়াছে, অদ্য তাহা লক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে।

যৌবনের প্রথম আরম্ভেই ইনি যখন প্রভূত ধনসম্পদের মধ্যে ঈশ্বরের করাঘাতে ভোগনিদ্রা হইতে সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিলেন, যখন সুপ্তোত্থিত শিশুর ন্যায় ইঁহার চিত্ত ক্ষুধা-পিপাসায় কাঁদিয়া উঠিল তখন চতুর্দিকে বিষয়সুখোপকরণের অন্ত ছিল না, কিন্তু ইঁহার ক্ষুধার অন্ন কোথায় ছিল? সেদিন কিসের অভাবে ইঁহার চারি দিকে সমস্ত ধনজনপূর্ণ সংসার বিরস হইয়া উঠিল, সূর্যকিরণ মলিন হইয়া গেল?

যে অন্নের জন্য মাতৃক্রোড়চ্যুত শিশুর ন্যায় তাঁহার সমস্ত অন্তঃকরণ ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার পিতার রাজদুর্লভ ঐশ্বর্য যে অন্নের একটি কণামাত্রও তাঁহার নিকটে বহন করিয়া আনিতে পারে নাই, বায়ুবাহিত একখানি ছিন্ন পত্র সেই পরমান্নের সন্ধান তাঁহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল— সেই পত্র বহু সহস্র বর্ষ পূর্বকার এই বাণী তাঁহার নিকট আনয়ন করিল—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

'জগতে যাহা-কিছু সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দেখিবে, তিনি যাহা দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, কাহারো ধনে লোভ করিবে না।'

শত শত বৎসর পূর্বে একদা যে ঋষি এই বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তিনি জানিতেন না তাঁহার এই বাক্য সুদূর ভবিষ্যতে এক খণ্ড পত্র অবলম্বন করিয়া ইংরাজরাজধানীতে কোনো বিলাস-লালিত ধনীর পুত্রকে অমৃত-

ধনের বার্তা বলিয়া দিবে।

সেই বিস্মৃতনামা বল্কলবসন বনবাসী ঋষির এই বাক্যটি যৌবনের মোহ ধনসম্পদের ব্যূহ ভেদ করিয়া কি আশ্চর্য শক্তির পরিচয় দিল! এই যে শক্তি সহস্র বৎসরকে জয় করিয়াছে, ধনরত্নরাশিকে পরাস্ত করিয়াছে, বাহিরে তাহা দেখিতে কি দীন কি দুর্বল! তাহা একটিমাত্র ক্ষুদ্র শ্লোক, একটিমাত্র ছিন্নপত্র তাহার বাহন—কিন্তু তাহার নিকট মানীর মস্তক নত, ভোগীর ভোগ লজ্জিত, ধনীর ধন ধূলিপুঞ্জ!

এই ক্ষুদ্র শ্লোকটি যে দেবেন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার সমস্ত ভোগৈশ্বর্যের অপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার জীবনের সেই ঘটনাটি এখন হইতে চিরদিন আমাদের সম্মুখে মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়া দিবে, মানুষের ভোগের বন্ধন শিথিল ও তাহার স্বার্থসুখকে লঘু করিতে থাকিবে—ইহা মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিল।

বন্ধুগণ, এ কথা কেহ মনে করিয়ো না যে, তিনি যে অভাব অনুভব করিয়াছিলেন, আমরা তো তাহা অনুভব করি না; অতএব তিনি যাহার অধিকারী হইয়াছেন মানুষ তাহার অধিকারী হইবে কি করিয়া? আমাদের সকলেরই অভাব সেই একই অভাব। আমরা যত অচেতনই হই-না কেন, ধনকে আমরা যতই প্রিয়, ভোগকে আমরা যতই বাঞ্ছনীয় মনে করি-না কেন, আমাদের অন্তরে অন্তরে সেই একমাত্র অভাব, ধন হইতে ধনে, ভোগ হইতে ভোগে, এক হইতে অন্যে নিত্য নিয়তই সেই একই অন্ন, সেই একই সম্পদ অশ্রান্তভাবে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। চাহিতেছি ইহা নিশ্চয়, কিন্তু কাহাকে চাহিতেছি, তাহা যথার্থভাবে জানি না। মহাপুরুষরাই আমাদের হইয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে, আমরা কি চাহি। তাঁহারাই বলিয়া দেন যে, তোমরা যে মনে করিতেছ যে তোমরা মরীচিকা চাহিতেছ, তাহা তো সত্য নহে;

তোমরা যে জল চাহিতেছ।

তাঁহারাই বলিয়া দেন যে—

তদেতৎ শ্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

'এই যে নিখিলের অন্তরতর আত্মা ইনি পুত্র হইতেও প্রিয়, বিত্ত হইতেও প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতেই প্রিয়।'

তাঁহারা যে প্রার্থনা করিয়াছেন—

অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়—'অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও'—ইহা যে আমাদের সকলেরই প্রার্থনা ; মানুষের সকল প্রার্থনার মধ্যেই এই প্রার্থনা রহিয়াছে। আমরা যখন ধনকে প্রার্থনা করিতেছি, তখন আমরা ধনকেই সত্য, ধনকেই আলোক, ধনকেই অমৃত জানিয়া প্রার্থনা করিতেছি। এই-সমস্ত বৃথা প্রার্থনার পরম দুঃখ হইতে কে আমাদিগকে মুক্তিদান করিবে! মানুষ যথার্থই যাহা চায়, মানুষকে কে তাহা সত্যভাবে সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত করিবে! সেই মহাত্মগণ— স্বার্থের অপেক্ষা পরমার্থ যাঁহাদের নিকট সহজেই বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, সুখের অপেক্ষা মঙ্গলকে যাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে বরণ করিয়াছেন, ধর্মেই যাঁহাদের আনন্দ, যাঁহাদের স্থিতি।

স্বর্গগত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মানুষের যথার্থ অভাবকে নিজের মধ্যে যথার্থভাবে অনুভব করিয়া তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষার সামগ্রীকে একান্ত-ভাবে সন্ধান করিয়া মানুষের অন্তরতর চিরন্তন সত্যকে তাঁহার তপোনিষ্ঠ দীর্ঘজীবনের দ্বারা বিশেষভাবে মানুষের আয়ত্তগম্য করিয়া গেলেন।

নবযৌবনারম্ভে যখন দেবেন্দ্রনাথ ব্যাকুলিতচিত্তে অমৃতের সন্ধানে

নিযুক্ত হইলেন, তখন ধনসম্পদের বন্ধন হইতে আর-একটি দুরূহতর বন্ধন তাঁহাকে ছেদন করিতে হইয়াছিল। ক্ষুধা যখন সত্য, পিপাসা যখন তীব্র তখন তাহাকে সংস্কারের দ্বারা শান্ত, প্রথার দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। তাঁহার চারি দিকের সমাজ ধর্ম বলিয়া তাঁহার সম্মুখে যে-সকল উপকরণ আনিয়া উপস্থিত করিল, তিনি সে-সমস্তকে অপরিতৃপ্তচিত্তে দূর করিয়া বলিতে লাগিলেন—

যেনাহং নামৃতং স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

ক্ষুধিত শিশুকে প্রত্যক্ষ মাতার স্তন ছাড়া দীর্ঘকাল আর কী দিয়া ভুলাইয়া রাখিবে! মানুষ যখন অচেতনভাবে থাকে, মানুষ যখন যথার্থভাবে ঈশ্বরকে চাহে না, তখন আচার বিচার প্রথার সংস্কারপাশ তাহাকে চারি দিকে জড়িত করিয়া ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতে থাকে —নিশ্চেষ্ট মানুষ তাহারই মধ্যে অনায়াসে আবৃত জড়িত হইয়া পড়িয়া থাকে। প্রত্যক্ষ সত্য, প্রত্যক্ষ আলোক, প্রত্যক্ষ অমৃতের জন্য যে মহাত্মার আকাঙ্ক্ষা সচেতনরূপে জাগ্রত হইয়া উঠে, তিনি এই-সমস্ত বহু-কালসঞ্চিত সংস্কারের স্তূপীকৃত আবরণ ছিন্ন করিয়া সর্বত্র ঈশ্বরের অব্যবহিত স্পর্শ সন্ধান করিবার জন্য ব্যাকুল বাহু প্রসারিত করেন। মানুষকে তাহার স্ব-রচিত জাল হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য মাঝে মাঝে এইরূপ নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসু মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে সেই সংস্কারবন্ধন হইতে মুক্তির চেষ্টায় প্রবৃত্ত করিয়াছেন। তাঁহার জীবন আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, জীবাত্মাপরমাত্মার মধ্যে কোনো ব্যবধান নাই— পরম সত্যকে অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে, নতুবা কিছুতেই আমাদের সার্থকতা হইতে পারে না।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এই চেষ্টা আমাদের হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবল-

ভাবে সঞ্চারিত হইয়া গেছে। হিন্দুধর্ম আজ নিদ্রিত নহে, তাহা অচেতন-ভাবে বাহ্য প্রথা পালনেই আপনার সমস্ত চেষ্টাকে বদ্ধ রাখে নাই— তাহা সত্যকে সন্ধান করিতে উদ্যত, শাস্ত্রের মর্মোদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত। এই উদ্যম, এই চেষ্টাই সমাজের প্রাণ— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সমাজের মধ্যে এই প্রাণ-সঞ্চার করিয়া গেছেন। তিনি সত্যের পথে জাগ্রতভাবে সমাজকে ধাবিত করিয়া দিয়াছেন, ইহার পরিণামফল বিচারের দিন এখনো উপস্থিত হয় নাই— কিন্তু ইহা নিশ্চয়, জড়ত্ব শ্রেয় নহে, চেতনাই শ্রেয়।

মহাত্মন্! ঈশ্বর তোমার জীবনের মধ্যে যে অগ্নি নিহিত করিয়াছিলেন সংসারের সমস্ত ভোগসম্পদের বাধা, দুঃখবিপত্তির অবরোধ সবলে অতিক্রম-পূর্বক তুমি তাহাকে প্রজ্বলিত করিয়া সমাজের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গেছ। তোমার সমস্ত জীবন সমগ্রতা লাভ করিয়া আমাদের সম্মুখে আজ মৃত্যুর অমৃত আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে— জীবিতকালে তোমাকে যেমন করিয়া নমস্কার করিয়াছি, আজ তদপেক্ষা সম্পূর্ণভাবে তোমার নিকট প্রণত হইলাম। দুর্বল মর্ত্যদেহ লইয়া তুমি যে মঙ্গলকে সংসারে প্রচার করিয়া গেছ— সেই মঙ্গলের মধ্যে অদ্য তোমাকে নমস্কার করি; দুর্বল মানবমন লইয়া তুমি যে সত্যকে সমাজে প্রচার করিয়া গেছ, সেই সত্যের মধ্যে তোমাকে নমস্কার করি; পার্থিবলীলার অবসানে যে শান্তিময় অমৃতে তুমি আশ্রয়লাভ করিয়াছ, সেই অমৃতের মধ্যে অদ্য তোমাকে নমস্কার করি। যাঁহার মধ্যে অদ্য তুমি আছ, তাঁহার নমস্কারের মধ্যে তোমার নমস্কার প্রেরণ করি। তোমার অমরজীবন চিরদিন ভোগসম্পদের মোহমত্ততা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক, দুঃখবিপদের অবসাদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক, জড়সংস্কারের আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক— বিশ্বহিতে আমাদিগকে নিযুক্ত করুক, স্বার্থসুখে আমাদিগকে বিরত করুক, সত্যে কুশলে ধর্মে মহত্ত্বে আমাদিগকে দৃঢ়-

প্রতিষ্ঠ করুক। যেমন উক্তি তুমি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গেছ, এক্ষণে তাহাই উচ্চারণ করি— সেই উক্তির সহিত তোমার দিব্যকণ্ঠের বাণী মিলিত করো।

ওঁ নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ—
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

'হে সুখকর কল্যাণকর, হে সুখকল্যাণের আকর, হে কল্যাণ, হে কল্যাণতর, তোমাকে বার বার নমস্কার করি।'

১১ মাঘ ১৩১১, মহর্ষিভবনে সন্ধ্যাকালে উপাসনাশেষে উপদেশ

হে পরমপিতঃ, হে পিতৃতমঃ পিতৃণাম্, এ সংসারে যাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি, অদ্য একাদশ দিন হইল তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জীবন হোমহুতাশনের ঊর্ধ্বমুখী পবিত্র শিখার ন্যায় তোমার অভিমুখে নিয়ত উত্থিত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার অবসানে তুমি তাঁহাকে কী শান্তিতে, কী অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছ—যিনি স্বর্গ কামনা করেন নাই, কেবল 'ছায়াতপয়োরিব' ব্রহ্মলোকে তোমার সহিত যুক্ত হইবার জন্য যাঁহার চরমাকাঙ্ক্ষা ছিল, অদ্য তাঁহাকে তুমি কিরূপ সুধাময় চরিতার্থতার মধ্যে বেষ্টন করিয়াছ, তাহা আমাদের মননের অগোচর— তথাপি হে মঙ্গলময়, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি অনন্তসত্য, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত সত্যচিন্তা নিঃশেষে সার্থক হয়—তুমি অনন্তকল্যাণ, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত শুভকর্ম সম্পূর্ণরূপে সফল হয়— আমাদের সমস্ত অকৃত্রিম প্রেম, হে আনন্দস্বরূপ, তোমারই মধ্যে সুন্দরভাবে ধন্য হয়— আমাদের পিতৃদেবের জীবনের সমস্ত সত্য, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত প্রেম তোমার মধ্যে অনির্বচনীয়রূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহা জানিয়া আমরা ভ্রাতাভগিনীগণ করজোড়ে তোমার জয়োচ্চারণ করিতেছি।

পৃথিবীতে অধিকাংশ সম্বন্ধই দানপ্রতিদানের অপেক্ষা রাখে— কিন্তু পিতামাতার স্নেহ প্রতিদান-প্রত্যাশার অতীত। তাহা পাপ, অপরাধ, কদর্যতা, কৃতঘ্নতা, সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। তাহা ঋণ নহে, তাহা দান। তাহা আলোকের ন্যায়, সমীরণের ন্যায় —তাহা শিশুকাল হইতে আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু

তাহার মূল্য কেহ কখনো চাহে নাই। পিতৃস্নেহের সেই অযাচিত সেই অপর্যাপ্ত মঙ্গলের জন্য, হে বিশ্বপিতঃ, আজ তোমাকে প্রণাম করি।

আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, আমাদের পিতামহের মৃত্যুর পরে এই গৃহের উপরে সহসা ঋণরাশিভারাক্রান্ত কী দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। পিতৃদেব একাকী বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দুস্তর ঋণসমুদ্র সন্তরণপূর্বক কেমন করিয়া যে কূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, আমাদের অদ্যকার অন্নবস্ত্রের সংস্থান কেমন করিয়া যে তিনি ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের জন্য রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সেই ঝঞ্ঝার ইতিহাস আমরা কী জানি। কতকাল ধরিয়া তাঁহাকে কী দুঃখ, কী চিন্তা, কী চেষ্টা, কী দশাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া প্রতিদিন প্রতিরাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর কণ্টকিত হয়। তিনি অতুল বৈভবের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন— অকস্মাৎ ভাগ্যপরিবর্তনের সম্মুখে কেমন করিয়া তিনি অবিচলিত বীর্যের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন! যাহারা অপর্যাপ্ত ধনসম্পদ ও বাধাহীন ভোগসুখের মধ্যে মানুষ হইয়া উঠে, দুঃখসংঘাতের অভাবে বিলাস-লালিত্যের সংবেষ্টনে বাল্যকাল হইতে যাহাদের শক্তির চর্চা অসম্পূর্ণ, সংকটের সময় তাহাদের মতো অসহায় কে আছে! বাহিরের বিপদের অপেক্ষা নিজের অপরিণত চারিত্রবল ও অসংযত প্রবৃত্তি তাহাদের পক্ষে গুরুতর শত্রু। এই সময়ে এই অবস্থায় যে ধনপতির পুত্র নিজের চিরাভ্যাসকে খর্ব করিয়া, ধনিসমাজের প্রভূত প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া, শান্তসংযত শৌর্যের সহিত এই সুবৃহৎ পরিবারকে স্কন্ধে লইয়া দুঃসহ দুঃসময়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন ও জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার সেই অসামান্য বীর্য, সেই সংযম, সেই দৃঢ়চিত্ততা, সেই প্রতিমুহূর্তের ত্যাগস্বীকার আমরা মনের মধ্যে

সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিই বা করিব কী করিয়া এবং তদনুরূপ কৃতজ্ঞতাই বা কেমন করিয়া অনুভব করিব। আমাদের অদ্যকার সমস্ত অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের পশ্চাতে তাঁহার সেই বিপত্তিতে অকম্পিত বলিষ্ঠ দক্ষিণহস্ত ও সেই হস্তের মঙ্গল-আশিস্‌স্পর্শ আমরা যেন নিয়ত নম্রভাবে অনুভব করি।

আমাদের সর্বপ্রকার অভাবমোচনের পক্ষে প্রচুর এই-যে সম্পত্তি তিনি সম্পূর্ণ নিজের বলে রক্ষা করিয়াছেন, ইহা যদি অধর্মের সহায়তায় ঘটিত, তবে অদ্য অন্তর্যামীর সম্মুখে সেই পিতার নিকটে শ্রদ্ধানিবেদন করিতে আমাদিগকে কুণ্ঠিত হইতে হইত। সর্বাগ্রে তিনি ধর্মকে রক্ষা করিয়া পরে তিনি ধন রক্ষা করিয়াছেন—অদ্য আমরা যাহা লাভ করিয়াছি তাহার সহিত তিনি অসত্যের গ্লানি মিশ্রিত করিয়া দেন নাই; আজ আমরা যাহা ভোগ করিতেছি তাহাকে দেবতার প্রসাদস্বরূপ নির্মলচিত্তে নিঃসংকোচে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইয়াছি।

সেই বিপদের দিনে তাঁহার বিষয়ী বন্ধুর অভাব ছিল না; তিনি ইচ্ছা করিলে হয়তো কৌশলপূর্বক তাঁহার পূর্বসম্পত্তির বহুতর অংশ এমন করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতেন যে, ধনগৌরবে বঙ্গীয় ধনীদের ঈর্ষাভাজন হইয়া থাকিতেন। তাহা করেন নাই বলিয়া আজ যেন আমরা তাঁহার নিকটে দ্বিগুণতর কৃতজ্ঞ হইতে পারি।

ঘোর সংকটের সময় একদিন তাঁহার সম্মুখে একই কালে শ্রেয়ের পথ ও প্রেয়ের পথ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। তখন সর্বস্ব হারাইবার সম্ভাবনা তাঁহার সম্মুখে ছিল—তাঁহার স্ত্রীপুত্র ছিল, তাঁহার মানসম্ভ্রম ছিল—তৎসত্ত্বে যেদিন তিনি শ্রেয়ের পথ নির্বাচন করিয়া লইলেন সেই মহা-দিনের কথা আজ যেন আমরা একবার স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের বিষয়লালসার তীব্রতা শান্ত হইয়া আসিবে এবং

সন্তোষের অমৃতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত হইবে। অর্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি; বর্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন তাহাও যেন গৌরবের সহিত গ্রহণ করিবার যোগ্য আমরা হইতে পারি।

তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধমাত্র বিষয়ী হইতেন তবে তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তিখণ্ডকে উত্তরোত্তর সঞ্চয়ের দ্বারা বহুলরূপে বিস্তৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিষয়বিস্তারের প্রতি লক্ষ রাখিয়া ঈশ্বরের সেবাকে তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার ভাণ্ডার ধর্মপ্রচারের জন্য মুক্ত ছিল— কত অনাথ পরিবারের তিনি আশ্রয় ছিলেন, কত দরিদ্র গুণীকে তিনি অভাবের পেষণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের কত হিতকর্মে তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে সাহায্য দিয়াছেন। এই দিকে কৃপণতা করিয়া তিনি কোনোদিন তাঁহার সন্তানদিগকে বিলাসভোগ বা ধনাভিমানচর্চায় প্রশ্রয় দেন নাই। ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ যেমন সমস্ত অতিথিবর্গের আহারশেষে নিজে ভোজন করেন, তিনি সেইরূপ তাঁহার ভাণ্ডারদ্বারের সমস্ত অতিথিবর্গের পরিবেশনশেষ লইয়া নিজের পরিবারকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি আমাদিগকে ধনসম্পদের মধ্যে রাখিয়াও আড়ম্বর ও ভোগোন্মত্ততার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং এইরূপে যদি তাঁহার সন্তানগণের সম্মুখ হইতে লক্ষ্মীর স্বর্ণপিঞ্জরের অবরোধদ্বার কিছুমাত্র শিথিল হইয়া থাকে, যদি তাঁহারা ভাবলোকের মুক্ত আকাশে অবাধবিহারের কিছুমাত্র অধিকারী হইয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা পিতার পুণ্যপ্রসাদে বহুতর লক্ষপতির অপেক্ষা সৌভাগ্যবান হইয়াছেন।

আজ এই কথা বলিয়া আমরা সকলের কাছে গৌরব করিতে পারি যে, এতকাল আমাদের পিতা যেমন আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে রক্ষা

করিয়াছিলেন, তেমনি ধনের গণ্ডির মধ্যেও আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। পৃথিবী আমাদের সম্মুখে মুক্ত ছিল— ধনী দরিদ্র সকলেরই গৃহে আমাদের যাতায়াতের পথ সমান প্রশস্ত ছিল। সমাজে যাঁহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন ছিল তাঁহারা সুহৃদ্‌ভাবেই আমাদের পরিবারে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পারিষদভাবে নহে। ভবিষ্যতে আমরা ভ্রষ্ট হইতে পারি, কিন্তু আমরা ভ্রাতাগণ দারিদ্র্যের অসম্মানকে এই পরিবারের ধর্ম বলিয়া জানিতে পাই নাই। ধনের সংকীর্ণতা ভেদ করিয়া মনুষ্যসাধারণের অকুন্ঠিত সংস্রবলাভ যাঁহার প্রসাদে আমাদের ঘটিয়াছে তাঁহাকে আজ আমরা নমস্কার করি।

তিনি আমাদিগকে যে কী পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছেন তাহা আমরা ছাড়া আর কে জানিবে! যে ধর্মকে তিনি ব্যাকুল সন্ধানের দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্মকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছেন, যে ধর্মের উদ্দেশে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ধর্মকে তিনি আপনার গৃহের মধ্যেও শাসনের বস্তু করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই, কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের কর্মকে বদ্ধ করেন নাই। তিনি কোনো বিশেষ মতকে অভ্যাস বা অনুশাসনের দ্বারা আমাদের উপরে স্থাপন করিতে চান নাই— ঈশ্বরকে ধর্মকে স্বাধীনভাবে সন্ধান করিবার পথ তিনি আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই স্বাধীনতার দ্বারা তিনি আমাদিগকে পরম সম্মানিত করিয়াছেন— তাঁহার প্রদত্ত সেই সম্মানের যোগ্য হইয়া সত্য হইতে যেন স্খলিত না হই, ধর্ম হইতে যেন স্খলিত না হই, কুশল হইতে যেন স্খলিত না হই। পৃথিবীতে কোনো পরিবার কখনোই চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে না, ধন ও খ্যাতিকে

কোনো বংশ চিরদিন আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটার ন্যায় এই গৃহের সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই একদিন দিগন্তরালে বিলীন হইয়া যাইবে, ক্রমে নানা ছিদ্রযোগে বিচ্ছেদবিশ্লেষের বীজ প্রবেশ করিয়া কোন্‌-এক দিন এই পরিবারের ভিত্তিকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া দিবে—কিন্তু এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরেজি-শিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশুবঙ্গভাষাকে বহুযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধসমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্য-পরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া, ইহার সর্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়া দিয়া, ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত মনুষ্যের ক্ষতি করিয়া দিয়া, আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, অদ্য সমস্ত ক্ষুদ্র মানমর্যাদা বিস্মৃত হইয়া অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব ও একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার নিকটে আপনাকে প্রণত করিয়া দিব—ও যাঁহার মধ্যে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, সমস্ত ধনমানের ঊর্ধ্বে, খ্যাতিপ্রতিপত্তির ঊর্ধ্বে তাঁহাকেই দর্শন করিব।

হে বিশ্ববিধাতঃ, আজ আমাদের সমস্ত বিষাদ-অবসাদ দূর করিয়া দাও—মৃত্যু সহসা যে যবনিকা অপসারণ করিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া তোমার অমৃতলোকের আভাস আমাদিগকে দেখিতে দাও। সংসারের নিয়ত উত্থানপতন, ধনমানজীবনের আবির্ভাব-তিরোভাবের মধ্যে, তোমার 'আনন্দরূপমমৃতম্‌' প্রকাশ করো। কত বৃহৎ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইতেছে, কত প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইতেছে, কত লোকবিশ্রুত খ্যাতি বিস্মৃতি-

মগ্ন হইতেছে, কত কুবেরের ভাণ্ডার ভগ্নস্তূপের বিভীষিকা রাখিয়া অন্তর্হিত হইতেছে— কিন্তু হে আনন্দময়, এই-সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে 'মধু বাতা ঋতায়তে' বায়ু মধু বহন করিতেছে, 'মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' সমুদ্রসকল মধু ক্ষরণ করিতেছে— তোমার অনন্ত মাধুর্যের কোনো ক্ষয় নাই, তোমার সেই বিশ্বব্যাপিনী মাধুরী সমস্ত শোকতাপবিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অদ্য আমাদের চিত্তকে অধিকার করুক।

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ মধু নক্তম্ উতোষসঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

'ওষধিরা আমাদের পক্ষে মাধ্বী হউক, রাত্রি এবং উষা আমাদের পক্ষে মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের পক্ষে মধুমান্ হউক, এই-যে আকাশ পিতার ন্যায় সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে ইহা আমাদের পক্ষে মধু হউক, সূর্য মধুমান্ হউক এবং গাভীরা আমাদের জন্য মাধ্বী হউক।'

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মাঘ ১৩১১ মহর্ষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষে প্রার্থনা

জগতে যে-সকল মহাপুরুষ ধর্মসমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা যাহা দিতে চাহিয়াছেন তাহা আমরা নিতে পারি নাই, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। শুধু পারি নাই যে তাহা নয়, আমরা এক লইতে হয়তো আর লইয়া বসিয়াছি। ধর্মের আসনে সাম্প্রদায়িকতাকে বরণ করিয়া হয়তো নিজেকে সার্থক জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।

তাহার একটা কারণ, আমাদের গ্রহণ করিবার শক্তি সকলের এক রকমের নয়। আমার মন যে পথে সহজে চলে, অন্যের মন সে পথে বাধা পায়। আমাদের এই মানসিক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া সকল মানুষের জন্যই একই বাঁধা রাজপথ বানাইয়া দিবার চেষ্টা আমাদের মনে আসে। কারণ, তাহাতে কাজ সহজ হইয়া যায়। সে চেষ্টা এ পর্যন্ত সফল হয় নাই। সফল হওয়া যে অসাধ্য, তাহাও আমরা ভালো করিয়া বুঝিতে পারি নাই। সেইজন্য যে পথে আমি চলিয়া অভ্যস্ত বা আমার পক্ষে যাহা সহজ, সেই পথই যে সকলের একমাত্র পথ নয়, কাহারো পক্ষে যে তাহা দুর্গম হইতে পারে, এ কথা আমরা মনেও করিতে পারি না। এইজন্যই এই পথেই সব মানুষকে টানা আমরা জগতের একমাত্র মঙ্গল বলিয়া মনে করি। এই টানাটানিতে কেহ আপত্তিপ্রকাশ করিলে আমরা আশ্চর্য বোধ করি, মনে করি— সে লোকটা হয় ইচ্ছা করিয়া নিজের হিত পরিত্যাগ করিতেছে, নয় তাহার মধ্যে এমন একটা হীনতা আছে যাহা অবজ্ঞার যোগ্য।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মনের মধ্যে গতিশক্তির যে বৈচিত্র্য দিয়াছেন, আমরা কোনো কৌশলেই তাহাকে একাকার করিয়া দিতে পারিব না। গতির লক্ষ্য এক, কিন্তু তাহার পথ অনেক। সব নদীই সাগরের দিকে

চলিয়াছে, কিন্তু সবাই এক নদী হইয়া চলে নাই। চলে নাই, সে আমাদের ভাগ্য।

ঈশ্বর কোনোমতেই আমাদের সকলকেই একটা বাঁধা পথে চলিতে দিবেন না। অনায়াসে চোখ বুজিয়া আমরা একজনের পশ্চাতে আর-একজন চলিব, ঈশ্বর আমাদের পথকে এত সহজ কোনোদিন করিবেন না। কোনো ব্যক্তি, তাঁহার যত বড়ো ক্ষমতাই থাক্‌, পৃথিবীর সমস্ত মানবাত্মার জন্য নিশ্চেষ্ট জড়ত্বের সুগমতা চিরদিনের জন্য বানাইয়া দিয়া যাইবেন, মানুষের এমন দুর্গতি বিশ্ববিধাতা কখনোই সহ্য করিতে পারেন না।

এইজন্য প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরতর স্তরে ঈশ্বর একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন; অন্তত সেখানে একজনের উপর আর-একজনের কোনো অধিকার নাই। সেখানেই তাহার অমরতার বীজকোষ বড়ো সাবধানে রক্ষিত; সেইখানেই তাহাকে নিজের শক্তিতে নিজে সার্থক হইতে হইবে। সহজের প্রলোভনে এই জায়গাটার দখল যে ব্যক্তিই ছাড়িয়া দিতে চায় সে লাভে-মূলে সমস্তই হারায়। সেই ব্যক্তিই ধর্মের বদলে সম্প্রদায়কে, ঈশ্বরের বদলে গুরুকে, বোধের বদলে গ্রন্থকে লইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। শুধু বসিয়া থাকিলেও বাঁচিতাম, দল বাড়াইবার চেষ্টায় পৃথিবীতে অনেক ব্যর্থতা এবং অনেক বিরোধের সৃষ্টি করে।

এইজন্য বলিতেছিলাম, মহাপুরুষেরা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, আর আমরা তাহার মধ্য হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্মটা লই না। কারণ, বিধাতার বিধানে ধর্ম জিনিসটাকে নিজের স্বাধীন শক্তির দ্বারাই পাইতে হয়, অন্যের কাছ হইতে তাহা আরামের ভিক্ষা মাগিয়া লইবার জো নাই। কোনো সত্যপদার্থই আমরা আর-কাহারো কাছ হইতে কেবল হাত পাতিয়া চাহিয়া পাইতে পারি না। যেখানে সহজ রাস্তা

ধরিয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছি সেখানেই ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তেমন করিয়া যাহা পাইয়াছি তাহাতে আত্মার পেট ভরে নাই, কিন্তু আত্মার জাত গিয়াছে।

তবে ধর্মসম্প্রদায় ব্যাপারটাকে আমরা কী চোখে দেখিব। তাহাকে এই বলিয়াই জানিতে হইবে যে, তাহা তৃষ্ণা মিটাইবার জল নহে, তাহা জল খাইবার পাত্র। সত্যকার তৃষ্ণা যাহার আছে সে জলের জন্যই ব্যাকুল হইয়া ফিরে, সে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে গণ্ডুষে করিয়াই পিপাসা-নিবৃত্তি করে। কিন্তু যাহার পিপাসা নাই সে পাত্রটাকেই সবচেয়ে দামী বলিয়া জানে। সেইজন্যই জল কোথায় পড়িয়া থাকে তাহার ঠিক নাই, পাত্র লইয়াই পৃথিবীতে বিষম মারামারি বাধিয়া যায়। তখন যে ধর্ম বিষয়বুদ্ধির ফাঁস আল্‌গা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল তাহা জগতে একটা নূতনতর বৈষয়িকতার সূক্ষ্মতর জাল সৃষ্টি করিয়া বসে ; সে জাল কাটানো শক্ত।

ধর্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতারা নিজের নিজের সাধ্যানুসারে আমাদের জন্য, মাটির হউক আর সোনার হউক, এক-একটা পাত্র গড়িয়া দিয়া যান। আমরা যদি মনে করি, সেই পাত্রটা গড়িয়া দিয়া যাওয়াই তাঁহাদের মাহাত্ম্যের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়, তবে সেটা আমাদের ভুল হইবে। কারণ, পাত্রটি আমাদের কাছে যতই প্রিয় এবং যতই সুবিধাকর হউক, তাহা কখনোই পৃথিবীর সকলেরই কাছে সমান প্রিয় এবং সমান সুবিধাকর হইতে পারে না। ভক্তির মোহে অন্ধ হইয়া, দলের গর্বে মত্ত হইয়া, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। কথামালার গল্প সকলেই জানেন—শৃগাল থালায় ঝোল রাখিয়া সারসকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, লম্বা ঠোঁট লইয়া সারস তাহা খাইতে পারে নাই ; তার পর সারস যখন সরুমুখ চোঙের মধ্যে ঝোল রাখিয়া শৃগালকে ফিরিয়া নিমন্ত্রণ করিল তখন শৃগালকে

ক্ষুধা লইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল। সেইরূপ এমন সর্বজনীন ধর্মসমাজ আমরা কল্পনা করিতে পারি না যাহা তাহার মত ও অনুষ্ঠান লইয়া সকলেরই বুদ্ধি রুচি ও প্রয়োজনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে।

অতএব শাস্ত্রীয় ধর্মমত ও আনুষ্ঠানিক ধর্মসমাজ স্থাপনের দিক হইতে পৃথিবীর ধর্মগুরুদিগকে দেখা তাঁহাদিগকে ছোটো করিয়া দেখা। তেমন করিয়া কেবল দলের লোকেরাই দেখিতে পারে এবং তাহাতে করিয়া কেবল দলাদলিকেই বাড়াইয়া তোলা হয়। তাঁহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটি দেখিবার আছে যাহা লইয়া সকল দেশে সকল কালে সকল মানুষকেই আহ্বান করা যায়— যাহা প্রদীপমাত্র নহে, যাহা আলো।

সেটি কী। না, যেটি তাঁহারা নিজেরা পাইয়াছেন। যাহা গড়িয়াছেন তাহা নহে। যাহা পাইয়াছেন সে তো তাঁহাদের নিজের সৃষ্টি নহে, যাহা গড়িয়াছেন তাহা তাঁহাদের নিজের রচনা।

আজ যাঁহার স্মরণার্থ আমরা সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি তাঁহাকেও যাহাতে কোনো-একটা দলের দিক হইতে না দেখি, ইহাই আমার নিবেদন। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সম্প্রদায়ের ধ্বজাকেই সর্বোচ্চ করিয়া ধরিতে গিয়া পাছে গুরুকেও তাহার কাছে খর্ব করিয়া দেন, এ আশঙ্কা মন হইতে কিছুতেই দূর হয় না— অন্তত আজিকার দিনে নিজেদের সেই সংকীর্ণতা তাঁহার প্রতি যেন আরোপ না করি।

অবশ্যই, কর্মক্ষেত্রে তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব নানা রূপে দেখা দিয়াছে। তাঁহার ভাষায়, তাঁহার ব্যবহারে, তাঁহার কর্মে তিনি বিশেষ-ভাবে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন— তাঁহার সেই স্বাভাবিক বিশেষত্ব জীবনচরিত-আলোচনা-কালে উপাদেয় সন্দেহ নাই। সেই আলোচনায় তাঁহার সংস্কার, তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার প্রতি তাঁহার দেশের ও কালের প্রভাব-সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য, আমাদের কৌতূহলনিবৃত্তি

করে। কিন্তু সেই-সমস্ত বিশেষ ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তাঁহার জীবন কি আর-কাহাকেও আমাদের কাছে প্রকাশ করিতেছে না। আলো কি প্রদীপকে প্রকাশ করিবার জন্য, না প্রদীপ আলোকে প্রচার করিবার জন্য? তিনি যাঁহাকে দেখিতেছেন ও দেখাইতেছেন, যদি আজ সেই দিকেই আমাদের সমস্ত দৃষ্টি না যায়, আজ যদি তাঁহার নিজের বিশেষত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি কোনো অংশে ঠেকিয়া যায়, তবে গুরুর অবমাননা হইবে।

মহর্ষি একদিন পরিপূর্ণ ভোগের মাঝখানে জাগিয়া উঠিয়া বিলাস-মন্দিরের সমস্ত আলোকে অন্ধকার দেখিয়াছিলেন। সেইদিন তিনি তৃষার্ত চিত্ত লইয়া পিপাসা মিটাইবার জন্য দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, সে কথা সকলেই জানেন। যেখান হইতে অমৃত-উৎস নিঃসৃত হইয়া সমস্ত জগৎকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, সেই তীর্থস্থানে তিনি না গিয়া ছাড়েন নাই। সেই তীর্থের জল তিনি আমাদের জন্যও পাত্রে ভরিয়া আনিয়াছিলেন। এ পাত্র আজ বাদে কাল ভাঙিয়া যাইতেও পারে, তিনি যে ধর্মসমাজ দাঁড় করাইয়াছেন তাহার বর্তমান আকৃতি স্থায়ী না হইতেও পারে; কিন্তু তিনি সেই-যে অমৃত-উৎসের ধারে গিয়া নিজের জীবনকে ভরিয়া লইয়াছেন, ইহাই আমাদের প্রত্যেকের লাভ। এই লাভ নষ্ট হইবে না, শেষ হইবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরকে আর-কাহারো হাত দিয়া আমরা পাইব না। তাঁহার কাছে নিজে যাইতে হইবে, তাঁহাকে নিজে পাইতে হইবে। দুঃসাধ্য হয় সেও ভালো, বিলম্ব হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। অন্যের মুখে শুনিয়া, উপদেশ পাইয়া, সমাজবিহিত অনুষ্ঠান পালন করিয়া, আমরা মনে করি যেন আমরা চরিতার্থতা লাভ করিলাম; কিন্তু সে তো ঘটির জল, সে তো উৎস নহে। তাহা মলিন হয়, তাহা ফুরাইয়া যায়,

তাহাতে আমাদের সমস্ত জীবন অভিষিক্ত হয় না এবং তাহা লইয়া আমরা বিষয়ী লোকের মতোই অহংকার ও দলাদলি করিতে থাকি। এমন ঘটির জলে আমাদের চলিবে না— সেই উৎসের কাছে আমাদের প্রত্যেককেই যাইতে হইবে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিজের একান্ত সম্বন্ধ তাঁহার সম্মুখে গিয়া আমাদিগকে নিজে স্বীকার করিতে হইবে। সম্রাট যখন আমাকে দরবারে ডাকেন তখন প্রতিনিধি পাঠাইয়া কি কাজ সারিতে পারি? ঈশ্বর যে আমাদের প্রত্যেককে ডাক দিয়াছেন, সেই ডাকে সাড়া দিয়া একেবারে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে কোনোমতেই আমাদের সার্থকতা নাই।

মহাপুরুষদের জীবন হইতে এই কথাটাই আমরা জানিতে পারি। যখন দেখি তাঁহারা হঠাৎ সকল কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়াছেন তখন বুঝিতে পারি, তবে তো আহ্বান আসিতেছে— আমরা শুনিতে পাই নাই, কিন্তু তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছেন। তখন চারি দিকের কোলাহল হইতে ক্ষণকালের জন্য মনটাকে টানিয়া লই, আমরাও কান পাতিয়া দাঁড়াই। অতএব মহাপুরুষদের জীবন হইতে আমরা প্রথমে স্পষ্ট জানিতে পারি, আত্মার প্রতি পরমাত্মার আহ্বান কতখানি সত্য। এই জানিতে পারাটাই লাভ।

তার পরে আর-একদিন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই— সুখে দুঃখে তাঁহারা শান্ত, প্রলোভনে তাঁহারা অবিচলিত, মঙ্গলব্রতে তাঁহারা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ। দেখিতে পাই— তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া কত ঝড় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের হাল ঠিক আছে; সর্বস্বক্ষতির সম্ভাবনা তাঁহাদের সম্মুখে বিভীষিকারূপে আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা অনায়াসেই তাহাকে স্বীকার করিয়া ন্যায়পথে ধ্রুব হইয়া আছেন; আত্মীয়বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে

সে-সকল বিচ্ছেদ বহন করিতেছেন।—তখনই আমরা বুঝিতে পারি, আমরা কী পাই নাই আর তাঁহারা কী পাইয়াছেন— সে কোন্ শান্তি, কোন্ বন্ধু, কোন্ সম্পদ। তখন বুঝিতে পারি, আমাদিগকেও নিতান্তই কী পাওয়া চাই, কোন্ লাভে আমাদের সকল অন্বেষণ শান্ত হইয়া যাইবে।

অতএব মহাপুরুষদের জীবনে আমরা প্রথমে দেখি তাঁহারা কোন্ আকর্ষণে সমস্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন; তাহার পরে দেখিতে পাই কোন্ লাভে তাঁহাদের সমস্ত ত্যাগ সার্থক হইয়াছে। এই দিকে আমাদের মনের জাগরণটাই আমাদের লাভ। কারণ, এই জাগরণের অভাবেই কোনো লাভই সম্পন্ন হইতে পারে না।

তার পরে যদি ভাবিয়া দেখি পাইবার ধন কোথায় পাওয়া যাইবে, কেমন করিয়া পাইব, তবে এই প্রশ্নই করিতে হইবে— তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, কেমন করিয়া পাইয়াছেন।

মহর্ষির জীবনে এই প্রশ্নের কী উত্তর পাই। দেখিতে পাই তিনি তাঁহার পূর্বতন সমস্ত সংস্কার সমস্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্তহস্তে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজের প্রচলিত প্রথা তাঁহাকে ধরিয়া রাখে নাই, শাস্ত্র তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই। তাঁহার ব্যাকুলতাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। সে পথ তাঁহার নিজেরই প্রকৃতির গভীর গোপন পথ। সব পথ ছাড়িয়া সেই পথ তাঁহাকে নিজে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইয়াছে। এ আবিষ্কার করিবার ধৈর্য ও সাহস তাঁহার থাকিত না, তিনিও পাঁচজনের পথে চলিয়া, ধর্ম না হউক, ধার্মিকতা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে যে 'না পাইলে নয়' হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য তাঁহাকে নিজের পথ নিজেকে বাহির করিতে হইয়াছে। সেজন্য তাঁহাকে যত দুঃখ, যত তিরস্কার হউক, সমস্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল— ইহা বাঁচাইবার জো নাই। ঈশ্বর যে তাহাই চান।

তিনি বিশ্বের ঈশ্বর হইয়াও আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি নিতান্ত, একমাত্র স্বতন্ত্র সম্বন্ধে ধরা দিবেন— সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিনি একটি দুর্ভেদ্য স্বাতন্ত্র্যকে চারি দিকের আক্রমণ হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়াছেন। এই অতি নির্মল নির্জন-নিভৃত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলনের স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে। সেইখানকার দ্বার যখন আমরা নিজের চেষ্টায় খুলিয়া তাঁহার কাছে আমাদের সেই চরম স্বাতন্ত্র্যের অধিকার একেবারে ছাড়িয়া দিব, বিশ্বের মধ্যে যাহা আমি ছাড়া আর-কাহারো নহে সেইটেই যখন তাঁহার কাছে সমর্পণ করিতে পারিব, তখনই আর আমার কিছু বাকি থাকিবে না, তখনই তাঁহাকে পাওয়া হইবে। এই-যে আমাদের স্বাতন্ত্র্যের দ্বার ইহার প্রত্যেকের চাবি স্বতন্ত্র; একজনের চাবি দিয়া আর্-একজনের দ্বার খুলিবে না। পৃথিবীতে যাঁহারা ঈশ্বরকে না পাওয়া পর্যন্ত থামেন নাই, তাঁহারা সকলেই ব্যাকুলতার নির্দেশ মানিয়া, নিজের চাবি নিজে যেমন করিয়া পারেন সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। কেবল পরের প্রতি নির্ভর করিয়া আলস্যবশত এ যাঁহারা না করিয়াছেন, তাঁহারা কোনো-একটা ধর্মমত, ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মসম্প্রদায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছেন ও সেইখানেই তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়া কলরব করিতেছেন, শেষ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছেন নাই।

আমাদের শক্তি যদি ক্ষীণ হয়, আমাদের আকাঙ্ক্ষা যদি সত্য না হয়, তবে আমরা শেষ পর্যন্ত কবে গিয়া পৌঁছিব জানি না। কিন্তু মহাপুরুষদের জীবন যেদিন আলোচনা করিতে বসিব সেদিন যেন সেই শেষলক্ষ্যের কথাটাই সম্মুখে রাখি, তাঁহাদের স্মৃতি যেন আমাদিগকে পারের ঘাটের আলো দেখায়, তাহাকে যেন আমরা কোনোদিন সাম্প্রদায়িক অভিযানের মশাল করিয়া না তুলি। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া দিবে, পরবশতা হইতে উত্তীর্ণ

করিয়া দিবে ; আমাদিগকে নিজের সত্যশক্তিতে সত্যচেষ্টায় সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবে। আমাদিগকে ভিক্ষা দিবে না, সন্ধান দিবে ; আশ্রয় দিবে না, অভয় দিবে ; অনুসরণ করিতে বলিবে না, অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে। এক কথায়, মহাপুরুষ তাঁহার নিজের রচনার দিকে আমাদিগকে টানিতেছেন না, ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিতেছেন। আজ আমরা যেন মনকে স্তব্ধ করি, শান্ত করি ; যাহা প্রতিদিন ভাঙিতেছে গড়িতেছে, যাহা লইয়া তর্কবিতর্ক বিরোধবিদ্বেষের অন্ত নাই, যেখানে মানুষের বুদ্ধির রুচির অভ্যাসের অনৈক্য, সে-সমস্তকেই মৃত্যুর সম্মুখে যেন আজ ক্ষুদ্র করিয়া দেখিতে পারি ; কেবল আমাদের আত্মার যে শক্তিকে ঈশ্বর আমাদের জীবন-মৃত্যুর নিত্যসম্বলরূপে আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাঁহার যে বাণী আমাদের সুখে-দুঃখে উত্থানে-পতনে জয়ে-পরাজয়ে চিরদিন আমাদের অন্তরাত্মায় ধ্বনিত হইতেছে, তাঁহার যে সম্বন্ধ নিগূঢ়রূপে নিত্যরূপে একান্তরূপে আমারই, তাহাই আজ নির্মলচিত্তে উপলব্ধি করিব ; মহাপুরুষের সমস্ত সাধনা যাঁহাতে সার্থক হইয়াছে, সমাপ্ত হইয়াছে— সমস্ত কর্মের খণ্ডতা, সমস্ত চেষ্টার ভঙ্গুরতা, সমস্ত প্রকাশের অসম্পূর্ণতা যে-এক পরম পরিণামের মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে— সেইদিকেই আজ আমাদের শান্তদৃষ্টিকে স্থির রাখিব। সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়া আমরা সেই পরলোকগত মহাত্মার নিকট আমাদের বিনম্র হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাঁহার স্মৃতিশিখরের ঊর্ধ্বে করজোড়ে সেই ধ্রুবতারার মহিমা নিরীক্ষণ করি— যে শাশ্বত জ্যোতি সম্পদ-বিপদের দুর্গম সমুদ্রপথের মধ্য দিয়া দীর্ঘদিনের অবসানে তাঁহার জীবনকে তাহার চরম বিশ্রামের তীর্থে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

৬ মাঘ ১৩১৩ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধসভায় পঠিত

৫

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর বাৎসরিক।

তিনি একদিন ৭ই পৌষে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শান্তি-নিকেতনের আশ্রমে সেই তাঁর দীক্ষাদিনের বার্ষিক উৎসব আমরা সমাধা করে এসেছি।

সেই ৭ই পৌষে তিনি যে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ৬ই মাঘ মৃত্যুর দিনে সেই দীক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তাঁর মহৎ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন।

শিখা থেকে শিখা জ্বালাতে হয়। তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদেরও অগ্নি গ্রহণ করতে হবে।

এইজন্য ৭ই পৌষে যদি তাঁর দীক্ষা হয়, ৬ই মাঘ আমাদের দীক্ষার দিন। তাঁর জীবনের সমাপ্তি আমাদের জীবনকে দীক্ষা দান করে—জীবনের দীক্ষা।

জীবনের ব্রত অতি কঠিন ব্রত, এই ব্রতের ক্ষেত্র অতি বৃহৎ, এর মন্ত্র অতি দুর্লভ, এর কর্ম অতি বিচিত্র, এর ত্যাগ অতি দুঃসাধ্য। যিনি দীর্ঘ জীবনের নানা সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, মানে অপমানে তাঁর একটি মন্ত্র কোনোদিন বিস্মৃত হন নি, তাঁর একটি লক্ষ্য হতে কোনোদিন বিচলিত হন নি, যাঁর জীবনে এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠেছিল 'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাম্, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু'—আমাকে ব্রহ্ম ত্যাগ করেন নি, আমি যেন তাঁকে ত্যাগ না করি, যেন তাঁকে পরিত্যাগ না হয়—তাঁরই কাছ থেকে আজ আমরা বিক্ষিপ্ত জীবনকে এক পরম লক্ষ্যে সার্থকতা দান করবার মন্ত্র গ্রহণ করব।

পরিপক্ব ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করে, তেমনি

মৃত্যুর দ্বারাই তিনি তাঁর জীবনকে আমাদের দান করে গেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। জীবন নানা সীমার দ্বারা আপনাকে বেষ্টিত করে রক্ষা করে; সেই সীমা কিছু-না কিছু বাধা রচনা করে।

মৃত্যুর দ্বারাই সেই মহাপুরুষ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন; তার সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে; এই জীবনকে নিয়ে আমাদের কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা নেই, কোনো লৌকিক ও সাময়িক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা নেই। তার সঙ্গে কেবল একটিমাত্র সম্পূর্ণ যোগ হয়েছে, সে হচ্ছে অমৃতের যোগ। মৃত্যুই এই অমৃতকে প্রকাশ করে।

মৃত্যু আজ তাঁর জীবনকে আমাদের প্রত্যেকের নিকটে এনে দিয়েছে, প্রত্যেকের অন্তরে এনে দিয়েছে। এখন আমরা যদি প্রস্তুত থাকি, যদি তাঁকে গ্রহণ করি, তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের রাসায়নিক সম্মিলনের কোনো ব্যাঘাত থাকে না। তাঁর পার্থিব জীবনের উৎসর্গ আজ কিনা ব্রহ্মের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে, সেইজন্যে তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে আমাদের সকলের হয়েছেন। বনের ফুল পূজা-অবসানে প্রসাদী ফুল হয়ে আজ বিশেষরূপেই সকলের সামগ্রী হয়েছেন। আজ সেই ফুলে তাঁর পূজার পুণ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, আজ সেই ফুলে তাঁর দেবতার আশীর্বাদ মূর্তিমান হয়েছে। সেই পবিত্র নির্মাল্যটি মাথায় করে নিয়ে আজ আমরা বাড়ি চলে যাব, এইজন্য তাঁর মৃত্যুদিনের উৎসব। বিশ্বপাবন মৃত্যু আজ স্বয়ং সেই মহৎজীবনকে আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়িয়েছেন—অদ্যকার দিন আমাদের পক্ষে যেন ব্যর্থ না হয়।

একদিন কোন্ ৭ই পৌষে তিনি একলা অমৃতজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনকার সংবাদ খুব অল্প লোকেই জেনেছিল। ৬ই মাঘে মৃত্যু যখন যবনিকা উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়াল তখন কিছুই আর প্রচ্ছন্ন

রইল না। তাঁর এক দিনের সেই একলার দীক্ষা আজ আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করবার অধিকারী হয়েছি। সেই অধিকারকে আমরা সার্থক করে যাব।

৬ মাঘ ১৩১৩ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর চতুর্থ সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভায় কথিত

৬

গত ৭ই পৌষ যাঁর দীক্ষাদিনের সাম্বৎসরিক উৎসব আমাদের আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়েছে— আজ এক মাস পরে তাঁরই মৃত্যুর স্মরণের সাম্বৎসরিক দিনে আমরা একত্রিত হয়েছি।

আমরা যারা জীবনপথের পথিক— তাদের তিনি তাঁর জীবনের যে দীক্ষা তা পাথেয়স্বরূপ দিয়ে গেছেন। সেই দান তাঁর এই আশ্রমে আকার ধারণ করেছে— এখানকার সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের মধ্যে তাঁর পূজার অর্ঘ্য সঞ্চিত হয়ে আছে। তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে যা দিয়েছেন তা আমরা প্রত্যক্ষভাবে পাচ্ছি— মৃত্যুর ভিতর দিয়ে যে অনন্ত জীবনের মধ্যে তিনি গেছেন, তার যাওয়ার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও আছে— কারণ যাঁর যথার্থ কিছু দেওয়া হয়েছে মৃত্যুর যবনিকার অন্তরালে তিনি অন্তর্হিত হন না।

মৃত্যুতে অন্তর্ধান ঘটে না, দূরত্ব ঘটে না, মানুষ যেখানে অমৃতকে লাভ করেছে সেখানে সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে গেছে, এইটি আজ স্মরণ করবার দিন।

আমার শয়নগৃহে যে ধূপ সন্ধ্যার সময় জ্বালা হয়, ক্রমে সে নিবে যায়, যখন রাত্রে শুতে যাই তখন আর কিছুই থাকে না। কালও ছিল না, পাত্রটি ভস্মে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। আজ প্রত্যূষে ঘুম ভেঙে দেখি ধূপের গন্ধে সব ঘর ভরে উঠেছে, ধূপপাত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ভস্ম নেই। এরকম কখনো হয় নি।— এতে আমার মনে এই কথাটি লাগল। আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকালে তপস্যার যে অগ্নি বিশুদ্ধরূপে জ্বলেছিল, যার গন্ধে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত হয়েছিল— কখন সে ভস্মাচ্ছন্ন হয়ে গেল। প্রত্যেক দেশেই তার সাধনার শ্রেষ্ঠ সত্য কোনো-না কোনো সময়ে

মলিন হয়ে আসে। শতাব্দী ধরে সে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেও পারে—কিন্তু সেই যে আগুন যাকে তিরোহিত মনে হয়েছে, ভস্মই যার প্রধান জিনিস বলে মনে হয়েছে—হঠাৎ দেখি সে জ্বলে উঠে সকল দিক আমোদিত করছে। এমনি করে সকল দেশের সত্য সাধনার ধন অন্তর্হিত হয়ে গিয়েও কোনো-না কোনো মানুষের চিত্তে জাগ্রত হয়; রুদ্ধদ্বার চার দিকে, একটা কোথাও দরজা খোলা পেয়ে অন্তরে এসে আঘাত করে। আজকে যাঁর স্মরণের দিন তাঁর জীবনে এইটি বিশেষ করে দেখেছি।

উপনিষদের ঋষিরা যে সত্যকে জ্বালিয়েছিলেন, নানা আবরণের মধ্যে তার দীপ্তি প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীনকালের জ্ঞানসম্পদের প্রতিমুখে শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও আমাদের জীবন থেকে তা দূরে সরে গিয়েছিল।

অথচ এই জ্ঞানের ধারাটি বিলুপ্ত হয় নি—নানা লোকের মধ্য দিয়ে অন্তঃসলিলা নদীর মতো তা গূঢ়ভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। হঠাৎ এই একজনকে দেখলুম, যিনি অকারণে, কিছুতেই বোঝা যায় না কেন—যা তাঁর চার দিকে কোথাও ছিল না, যাকে জানতেনও না, তার সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। কোথা থেকে তাঁর অভাব-বোধ এল—সে কী ব্যাকুলতা!—আমাদের ইতিহাসের মধ্যে যা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, ভারতবর্ষের সেই চিরকালের সাধনার ধন খোঁজবার প্রেরণা তাঁর হঠাৎ এল।

আমাদের জাতীয় অভ্যাস, ব্যক্তিগত অভ্যাস, ক্রমে উচ্চ হয়ে আমাদের কারাগার হয়ে ওঠে। চিরাগত অভ্যাসের দোষ এই—মানুষের চিত্তকে আলস্যের দ্বারা সে জড়ীভূত করে দেয়। অভ্যাস হচ্ছে নানা লোকের চিন্তায় আচারে খেয়ালে তৈরি করা পাথরের দুর্গ, আমাদের অলস চিত্ত এর মধ্যে আশ্রয় নিতে চায়, এই আশ্রয়ের ভিতর

বসে সে ভাবে, 'পেয়েছি'।— কিন্তু এই দেওয়াল, চিত্তকে সত্যের সঙ্গে অব্যবহিতভাবে যুক্ত না করে বিচ্ছিন্ন করে। এই অভ্যাস প্রচণ্ড আঘাতে যখন ভেঙে যায়, তখনি আমরা সত্যের মুখোমুখি হতে পারি। মহর্ষির মনও বাল্যকাল থেকে দেশের, পরিবারের, আচরণ-পদ্ধতি এবং অভ্যাসের দ্বারা জড়ীভূত ছিল। তাঁর চিত্ত স্বভাবত ভক্তিপ্রবণ ছিল; তাঁর দিদিমা প্রভৃতি যে অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকতেন তার সঙ্গে তাঁর প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ আজন্মকাল থেকে দৃঢ় হয়েছিল— কিন্তু এমন সময় দিদিমার মৃত্যু যখন তাঁকে আঘাত করলে তখন তিনি বুঝলেন যে, যে-সব অভ্যাসের দ্বারা তিনি পরিবৃত, তা তাঁকে সেই সত্যের পরিচয় দিচ্ছিল না যা মৃত্যুর ক্ষতির মধ্য দিয়ে অমৃতের পরিপূর্ণের অভিজ্ঞতায় নিয়ে যায়।

মৃত্যুর আঘাত অমৃতের অভিজ্ঞতায় সচেতন করে তুলবে এই তার প্রধান কাজ। কিন্তু মৃত্যুশোকও জড়তার দ্বার না ভাঙতে পারে, যদি আমাদের আবরণ কঠিন ও আমাদের প্রাণের তেজ কঠিন থাকে।

মহর্ষি শিশুর মতো জাগ্রত হয়ে তাঁর ক্ষুধার অন্নের জন্য চার দিকে চাইলেন, অনেক খুঁজলেন, কোথাও অমৃতকে পেলেন না; মনে হল মৃত্যু সবশেষে নিয়ে গেল, তার উর্ধ্বে কিছুই নেই। তবুও তিনি অনুভব করলেন সত্য রয়েছেন, কিন্তু কোনো বাধাবশত তাকে পাচ্ছি না।

তিনি শাস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে পথ খুঁজতে লাগলেন, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করলেন, নানা পণ্ডিতকে নিয়ে নানা সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। হঠাৎ একদিন একটি ছিন্ন পত্র উড়ে এল ঈশোপনিষদের বাণী নিয়ে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্—

'ঈশ্বরের দ্বারা সবকে আচ্ছন্ন করে দেখবে— যা-কিছু আছে যা-কিছু চলছে, ত্যাগের দ্বারা লাভ করবে, লোভ করবে না।' এ ছিন্ন পত্রের অর্থও তখন তিনি জানতেন না— পণ্ডিতের কাছে গেলেন এর অর্থ বুঝে নিতে। তখন থেকে উপনিষদের সাধনা তাঁর জীবনকে পরম আশ্রয় দিয়ে এসেছে।

আমাদের ঋষিরা যে মন্ত্র দেখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন তাকে প্রমাণ করবার ভার আমাদের প্রত্যেকের উপর আছে— যতক্ষণ সে শুধু পুঁথির মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তা হয় না। আমাদের দেশে এমন কথাও শোনা যায়— এ-সব বড়ো ভাব, বড়ো কথা, মুনিঋষিদের জন্য, সংসারীর পক্ষে ও-সব নয়। আমাদের সাধকেরা, যে সত্যকে জীবনে লাভ করেছিলেন তাকে এর চাইতে আর কোনোমতে বেশি তিরস্কৃত করা যায় না। তাঁরা বলেছেন তাঁকে না পেলে 'মহতী বিনষ্টিঃ'— এ যদি তোমার জীবনের ভিতর দিয়ে না জানলে তবে সমস্ত জন্ম ব্যর্থ হয়ে গেল, এত বড়ো বিনাশ আর নেই। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে বিশ্বাস করো, অভ্যাসের দ্বারা জড়িত হয়ে থেকো না, দুর্বল আত্মাকে আলস্যে মগ্ন করে এত বড়ো বাণীকে অপমানিত করতে দিয়ো না!

আমাদের দেশের সত্যকে নিজের জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত করে-ছিলেন— চন্দন সিন্দুর দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখে তাকে শুধু মুখের পূজা দেন নি। পাপতাপ সুখদুঃখের দ্বারা তরঙ্গায়িত এই সংসারের মধ্যেই সেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং'কে জীবনে পাওয়া যায়— যদি কিছু বড়ো জিনিস জীবনে পেয়ে থাকি, তাঁর সংস্পর্শে এই বিশ্বাসকে পেয়েছি।

সত্যের জন্য যাঁদের ব্যাকুলতা আছে তাঁরা তাকে নিজের চারি দিকে পান, তাঁদের আর-কিছুর দরকার হয় না। অন্যেরা বাইরের জিনিসকে সত্যের পরিবর্তে নেয়। সত্যের সাধনা না করে আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা

তাকে পাবার চেষ্টা, ঘুষ দিয়ে লাভের চেষ্টার মতোই মানুষের একটা বড়ো মোহ। একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষা না জাগলে সেই আকাঙ্ক্ষিত পরম ধন পাওয়া যায় না। শুধু মুখের কথায় নয়— তাঁর ধন প্রাণ, দীর্ঘজীবনের সব শোকদুঃখ বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে, তাঁর সেই পরম আশ্রয় শিবম্ শান্তম্ -এর যোগ কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হতে তিনি দেন নি; 'সত্যং' তাঁর কাছে তাঁর ঘরের দেওয়ালের মতোই সত্য ছিলেন। সেই পরম পুরুষকে জীবনের সব ক্ষেত্রকে পূর্ণ করে যেমন তিনি দেখেছিলেন— তেমনি ভারতবর্ষের সেই বড়ো সাধনা ইতিহাসের নানা যবনিকায় যা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, মনকে নির্মল করে, জীবনকে বিশুদ্ধ করে তাকে প্রকাশ করা— এও তাঁর জীবনের সাধনার বস্তু ছিল। কোনো সম্প্রদায়ের ভিতরে দিয়ে তিনি এ চেষ্টা করেন নি, তিনি জানতেন সম্প্রদায় নানা বাধাগ্রস্ত— নানা স্থূলতা, নানা ক্ষুদ্রতা সেখানে সত্যকে অস্পষ্ট ও বিকৃত করে তোলে। শেষ জীবনে বার বার তাঁর মুখ থেকে শুনেছি এই শান্তিনিকেতনেরই মধ্যে তাঁর জীবনের সার্থকতা নিহিত। এই শান্তিনিকেতনে যেখানে কোনো সম্প্রদায়ের নূতন বা পুরাতন আবর্জনা সঞ্চিত হয়ে ওঠে নি, যেখানে উন্মুক্ত আকাশ, অবারিত আলোক— এইখানে তিনি কিছু পেয়েছেন, কিছু দিয়েছেন। 'অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও' এই প্রার্থনা এই আশ্রমের অন্তরে তিনি দান করে গেছেন— যে প্রার্থনা বহুকাল থেকে চলে এসেছিল, যা মানুষ বিস্মৃত হয়েও হয় না— চিরকালের সেই প্রার্থনা তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের দান করে গেছেন।

গাছ, মাটি থেকে বাতাস থেকে, সূর্যের আলো থেকে খাদ্য ও তেজ আহরণ করে আনে, সে তার নিজের জিনিস নয়— কিন্তু তাকে নিজের জীবন দিয়ে ফলাতে হয়। তিনি এই ব্যাকুল প্রার্থনা তাঁর জীবনে

ফলিয়ে গেছেন, তাই এই মন্ত্রটি আজ এত সহজগম্য হয়েছে। তাঁর মুখ থেকে যা পেয়েছি, তাঁর মৃত্যুর দিনে তা উচ্চারণ করে আজকের কাজ শেষ হোক—

'অসতো মা সদ্গময়—'।

৬ মাঘ ১৩২৮ মহর্ষিদেবের মৃত্যুদিনে কথিত

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর সাম্বৎসরিক দিন।

আমি যখন জন্মেছি তখন থেকে তিনি হিমালয়ে ও দূরে দূরে ভ্রমণ করেছেন। দু-তিন বছর পর পর তিনি যখন বাড়ি আসতেন তখন সমস্ত পরিবারে একটা পরিবর্তন অনুভব করতুম— সেটা আমার অল্প বয়সকে ভয়েতে সম্ভ্রমে অভিভূত করত। সেই আমার বালক-বয়সে তাঁর সত্তার যে মূর্তি আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল সে হচ্ছে তাঁর একক ও বিরাট নিঃসঙ্গতার রূপ। তাঁর এই ভাবটি আমায় খুব স্তম্ভিত করত— এ আমার স্মরণে আছে। কেমন যেন মনে হত যে, নিকটে থাকলেও তিনি যেন দূরে দূরে রয়েছেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা যেমন সন্নিকটবর্তী গিরিশৃঙ্গসমূহ থেকে পৃথক হয়ে তার উত্তুঙ্গ তুষারকান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমার কাছে ঠিক তেমনিভাবে আমার পিতৃদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। সমবেত আত্মীয়স্বজন-পরিবারবর্গ থেকে তিনি অতি সহজে পৃথক সমুচ্চ শুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক রূপে প্রতিভাত হতেন। তখন আমি ছোটো ছিলুম; ছোটো ছেলেকে লোকে যেমন কাছে ডেকে ছোটো প্রশ্ন শুধোয় সেইরকম-ভাবে তিনি তখন আমায় ডেকে দু-এক কথা জিজ্ঞেস করতেন। আমার অগ্রজেরা কেবলমাত্র নিজেদের জীবন সম্বন্ধে নয়, সংসারের নানাবিধ খুঁটিনাটি কাজ সম্পর্কেও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন ও তাঁর কাছ থেকে নানাবিধ নির্দেশ পেয়েছেন— সে সুযোগ প্রথম বয়সে আমার ঘটে নি। তবু পিতৃদেবকে দেখে আমার ক্রমাগত উপনিষদের একটি কথা মনে হয়েছে: 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ', যিনি এক তিনি এই আকাশে বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন।

এখন মনে হয়, তাঁর সেই নিঃসঙ্গতার অর্থ যেন কিছু কিছু বুঝতে

পারি। এখন বুঝতে পারি যে, তিনি বিরাট নিরাসক্ততা নিয়েই জন্মেছিলেন। তাঁর পিতার বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভার ছিল, বাহিরের দিক দিয়ে সেই ঐশ্বর্যের কতরকম প্রকাশ হত তার ইয়ত্তা নেই। আহারে বিহারে বিলাসে ব্যসনে কত ধুম, কত জনসমাগম। পিতৃদেব সেই ভিড়ের মধ্যে থেকেও ভিড় থেকে দূরে থাকতেন। আপনার ব্যক্তিত্বের মর্যাদা নিয়ে আপনাতে নিবিষ্ট থাকা, এই ছিল তাঁর স্বভাব। অথচ কর্মেও তাঁকে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। আমার পিতামহের অধিকাংশ অর্থ যে ব্যাঙ্কে খাটত সেইখানে তাঁরই নির্দেশক্রমে সামান্য পারিশ্রমিকে আমার পিতাকে কাজ করতে হত। যাতে তিনি বিষয়কর্মে নিপুণ হয়ে ওঠেন তার জন্যে পিতামহ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতেন। যদিও দায়িত্বজনক অনেক কাজ তিনি সুচারুরূপে নির্বাহ করতেন, তবু সমস্ত বিষয়কর্মের উপর তাঁর ঔদাসীন্য ও অনাসক্তি দেখে পিতামহ ক্ষুণ্ণ হতেন। তখন তাঁর যৌবনকাল, বাইরের আড়ম্বর ও চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে পড়া হয়তো তাঁর মতো অবস্থায় বিশেষ আশ্চর্যকর হত না ; কিন্তু সমস্ত কর্মের মধ্যে জড়িত থেকেও তিনি সকল কর্মের ঊর্ধ্বে ছিলেন। সামাজিক দিক দিয়েও আবিষ্ট হয়ে পড়ার মতো অনুকূল অবস্থা তখন তাঁর প্রবল ছিল ; অনেক পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক তখন পিতামহের কাছে বিষয় বা অন্যবিধ ব্যাপার নিয়ে নিত্য উপস্থিত হতেন। উপরন্তু দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বাড়ির এবং পাথুরেঘাটার রাজবাটীর আত্মীয়সমবায় নিয়ে সেই বহুদূর-পরিব্যাপ্ত সম্পর্কিত মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁকে সংস্পর্শে আসতে হত। আমি ঠিক জানি নে অবশ্য, তবে নিশ্চিত অনুভব করতে পারি যে, এই আর্থিক প্রতিপত্তি ও সামাজিক সমারোহের মধ্যেও তিনি সেই উপনিষদ্‌-বর্ণিত একক পুরুষের মতো বৃক্ষের স্তব্ধ নিঃসঙ্গতা রক্ষা করে চলতেন। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের তৎকালীন বিপুল ঐশ্বর্যের আমরা যথাযথ ধারণাই

করতে পারি না; পিতৃদেবের মুখে শুনেছি যে, পিতামহ যখন বিলাতে অবস্থান করতেন তখন মাসিক তাঁকে লক্ষাধিক টাকা পাঠানো হত। পিতামহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, প্রকাণ্ড এক ভূমিকম্পের ফলে যেন, সেই বিরাট ঐশ্বর্য এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সেই সংকটের মধ্যেও পিতৃদেব অবিচলিত— বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ। তখন তিনি মন্ত্র গ্রহণ করছেন; হয়তো তখনই সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারলেন উপনিষদ্ যে মহৎ বাণী প্রচার করে গেছে— ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

আমার অভিজ্ঞতার মধ্যেই দেখেছি, অনেক শোকাবহ ব্যাপারে. আত্মীয়স্বজনের বিয়োগবিচ্ছেদে, তিনি তাঁর সেই তেতালার ঘরে আত্ম-সমাহিত হয়ে একা বসে আছেন। কেউ সাহস করত না তাঁকে সান্ত্বনা দিতে। বাইরের আনুকূল্যের তিনি কোনোদিন অপেক্ষা রাখেন নি; আপনি আপনার মধ্যে আনন্দ পেতেন।

আমার যখন উপনয়ন হল, দশ বছর বয়সে— মুণ্ডিত কেশ, তার জন্য একটু লজ্জিত ছিলেম— তিনি হঠাৎ আমায় ডেকে বললেন, "হিমালয়ে যেতে ইচ্ছে কর?" আমার তখনকার কী আনন্দ বলবার ভাষা নেই। সেকালে লুপ-লাইনটাই ছিল মেন-লাইন— রাস্তায় আমাদের প্রথম বিরামের জায়গা হল শান্তিনিকেতন। সে জায়গার সঙ্গে এখানকার এ জায়গার অনেক তফাত— ধুধু করছে প্রান্তর, শ্যামল বৃক্ষচ্ছায়ার অবকাশ নেই প্রায় কোথায়ও। সেই ঊষর রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে, আজকাল যেটা অতিথিশালা তারই একটা ছোটো ঘরে, আমি থাকতুম, অন্যটাতে তিনি থাকতেন। তাঁরই রোপণ-করা শালবীথিকা তখন বড়ো হতে আরম্ভ করেছে। তখন আমার কবিতা লেখার পাগলামো তার আদিপর্ব পেরিয়েছে; নাট্যঘরের পাশে একটা নারিকেলগাছ ছিল,

তারই তলায় বসে 'পৃথ্বীরাজবিজয়'[১] নামে একটি কবিতা রচনা করে গর্ব অনুভব করেছিলুম। খোয়াইয়ে বেড়াতে গিয়ে নানা রকমের বিচিত্র নুড়ি সংগ্রহ করা, আর এ ধারে ও ধারে ঘুরে গুহাগহ্বর গাছপালা আবিষ্কার করাই ছিল আমার কাজ। ভোরবেলায় উঠিয়ে দিয়ে তিনি আমায় শ্রীভগবদ্‌গীতা থেকে তাঁর দাগদেওয়া শ্লোক নকল করতে দিতেন; রাত্রে সৌর জগতের গ্রহতারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এ ছাড়া তখন তিনি আমাকে একটু-আধটু ইংরেজি ও সংস্কৃতও পড়াতেন। তবু তাঁর এত কাছে থেকেও সর্বদা মনে হত, তিনি যেন দূরে দূরে রয়েছেন। এই সময় দেখতুম যে, আশপাশের লোকেরা কথায়-বার্তায় আলাপে-আলোচনায় তাঁর চিত্তবিক্ষেপ করতে সাহসই করত না। সকালবেলা অসমাপ্ত শুকনো পুকুরের ধারে উঁচু জমিতে ও সন্ধ্যায় ছাতিমতলায় তাঁর যে ধ্যানের আত্মসমাহিত মূর্তি দেখতুম সে আমি কখনো ভুলব না।

তার পর হিমালয়ের কথা। তীব্র শীতের প্রত্যুষে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁকে দেখতুম, বাতি হাতে। তাঁর দীর্ঘ দেহ লাল একটা শালে আবৃত করে তিনি আমায় জাগিয়ে দিয়ে উপক্রমণিকা পড়তে প্রবৃত্ত করতেন। তখন দেখতুম আকাশে তারা, আর পর্বতের উপর প্রত্যুষের আবছায়া অন্ধকারে তাঁর পূর্বাস্য ধ্যানমূর্তি, তিনি যেন সেই শান্ত স্তব্ধ আবেষ্টনের সঙ্গে একাঙ্গীভূত। এই কদিন তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য সত্ত্বেও এটা আমার বুঝতে দেরি হত না যে, কাছে থেকেও তাঁকে নাগাল পাওয়া যায় না। তার পরে স্বাস্থ্যভঙ্গের সময় তিনি যখন কলকাতায় ছিলেন তখন আমার যুবক-বয়সে তাঁর কাছে প্রায়ই বিষয়কর্মের ব্যাপার নিয়ে যেতে হত। প্রতি মাসের প্রথম তিনটে দিন ব্রাহ্মসমাজের খাতা, সংসারের খাতা,

১ 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়', দ্রষ্টব্য জীবনস্মৃতি, 'হিমালয়যাত্রা'

জমিদারির খাতা নিয়ে তাঁর কাছে কম্পান্বিতকলেবরে যেতুম। তাঁর শরীর তখন শক্ত ছিল না, চোখে কম দেখতেন, তবুও শুনে শুনে অঙ্কের সামান্য ত্রুটিও তিনি চট করে ধরে ফেলতেন। এই সময়েও তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততা আমায় বিস্মিত করেছে।

আমাদের সকল আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে তিনি ছিলেন তেমনি একা যেমন একা সৌরপরিবারে সূর্য— স্বীয় উপলব্ধির জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে তিনি আত্মসমাহিত থাকতেন। তাঁর প্রকৃতিগত নিরাসক্তির প্রকৃত দান হল এই আশ্রম, জনতা থেকে দূরে অথচ কল্যাণসূত্রে জনতার সঙ্গে আবদ্ধ। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে যে আনন্দ, এবং আত্মার আনন্দ, এই দুয়েরও প্রতীক হল এই আশ্রম। এই দুই আনন্দ মিলে তাঁর জীবনকে পরিপূর্ণ করেছিল। যে চিত্তবৃত্তি থাকলে মানুষকে সংঘবদ্ধ করা যায় সে তাঁর ছিল না। উপনিষদের মন্ত্র-উপলব্ধির আনন্দ তাঁর অন্তরে নিহিত ছিল— সাধারণের জন্যে সে আনন্দকে ছোটো করে বা জল মিশিয়ে পরিবেশন করতে পারেন নি। এই-সকল কারণেই তাঁর চার দিকে বিশেষ কোনো-একটা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে নি। আপনার চরিত্র ও জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর জ্ঞান ও প্রেমের আদর্শ রেখে গেছেন। এর চেয়ে বেশি কিছু তিনি রেখে যান নি, কারণ জনতাকে বন্দী করার দুর্গ প্রতিষ্ঠা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

তাঁর প্রকৃত দান এই আশ্রম; এই আশ্রমে আসতে হলে দীক্ষা নিতে হয় না, খাতায় নাম লিখতে হয় না— যে আসতে পারে সেই আসতে পারে, কারণ এ তো সম্প্রদায়ের নয়। এর ভিতরকার বাণীটা হল 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।' আশ্রমের মধ্যে যে গভীর শান্তি আছে সেটা কেউ মুক্তভাবে নিতে পারে তো নেয়। মোহমুগ্ধ ক'রে তো সে আনন্দ দেওয়া যায় না। সেইজন্যেই কখনো বলেন নি যে, তাঁর বিশেষ একটা মত

কাউকে পালন করতে হবে। তাঁর প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে আমার আধুনিকপন্থী অগ্রজেরা অনেক বিরুদ্ধতা করেছেন, তিনি কিন্তু কখনো প্রতিবাদ করেন নি। আমার মধ্যেও অনেক-কিছু ছিল, অনেক মতবাদ, যার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয় নি, তবু তিনি শাসন ক'রে তাঁর অনুবর্তী হতে কখনো আজ্ঞা করেন নি। তিনি জানতেন যে, সত্য শাসনের অনুগত নয়, তাকে পাওয়ার হলে পাওয়া যায়, নইলে যায়ই না। অত্যাচার করেন অনেক গুরু, নিজেদের মতবাদ দিয়ে অনুবর্তীদের আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করে গিঁট বাঁধতে গিয়ে তাঁরা সোনা হারান। আমার পিতৃদেব স্বতন্ত্র ছিলেন, আমাদের স্বাতন্ত্র্যও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কোনোদিন বাঁধতে চান নি। মরবার আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে যেন তাঁর কোনো বাইরের চিহ্ন বা প্রতিকৃতি না থাকে। তাঁর এই অন্তিম বচনে সেই নিঃসংসক্ত আত্মার মুক্তির বাণী যেন ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন, যদি নিজেকে মুক্তি দিতে হয় তবে অন্যকেও মুক্তি দিতে হবে। যা বড়ো, কেবলমাত্র মুক্তির ক্ষেত্রেই তা থাকতে পারে। মুক্ত আকাশেই জ্যোতিষ্ক সঞ্চরণ করে। প্রদীপকেই কুটিরের মধ্যে সন্তর্পণে রাখতে হয়। এই মুক্তির শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি। তাঁর কাছেই শিখেছি যে, সত্যকে জোর করে দেওয়া যায় না; বহু বিরুদ্ধতার ভিতর অপেক্ষা করে থাকতে হয়। এই আমার আজকের দিনের কথা।

৬ মাঘ ১৩৪২ মহর্ষির মৃত্যুবার্ষিকীতে কথিত

২

৭ই পৌষ

মহর্ষির দীক্ষার দিন তথা শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্মস্থান যদি উদ্‌ঘাটন করে দেখি তবে দেখতে পাব, এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে, যে বীজ থেকে এই আশ্রম-বনস্পতি জন্মলাভ করেছে; সে হচ্ছে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ।··· সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন একে সৃষ্টি করে তুলছে।"

৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বর্ষে মহর্ষির এই দীক্ষার মর্মকথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এই-সকল ভাষণের কয়েকটি এই বিভাগে সংকলিত হইল।

অপর কয়েকটি ভাষণ হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ মহর্ষি-প্রসঙ্গ বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছে।

১

একদিন যাঁর চেতনা বিলাসের আরামশয্যা থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল, এই ৭ই পৌষ দিনটি সেই দেবেন্দ্রনাথের দিন। এই দিনটিকে তিনি আমাদের জন্যে দান করে গিয়েছেন। রত্ন যেমন করে দান করতে হয় তেমনি করে দান করেছেন। ওই দিনটিকে এই আশ্রমের কৌটোটির মধ্যে স্থাপন করে দিয়ে গেছেন। আজ কৌটো উদ্‌ঘাটন করে রত্নটিকে এই প্রান্তরের আকাশের মধ্যে তুলে ধরে দেখব, এখানকার ধূলিবিহীন নির্মল নিভৃত আকাশতলে যে নক্ষত্রমণ্ডলী দীপ্তি পাচ্ছে সেই তারাগুলির মাঝখানে তাকে তুলে ধরে দেখব। সেই সাধকের জীবনের ৭ই পৌষকে আজ উদ্‌ঘাটন করার দিন— সেই নিয়ে আমরা আজ উৎসব করি।

এই ৭ই পৌষের দিনে সেই ভক্ত তাঁর দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন— সেই দীক্ষার যে কত বড়ো অর্থ আজকের দিন কি সে কথা আমাদের কাছে কিছু বলছে? সেই কথাটি না শুনে গেলে কী জন্যেই বা এসেছি আর কী নিয়েই বা যাব?

সেই যেদিন তাঁর জীবনে এই ৭ই পৌষের সূর্য একদিন উদিত হয়েছিল সেই দিনে আলোও জ্বলে নি, জনসমাগমও হয় নি— সেই শীতের নির্মল দিনটি শান্ত ছিল, স্তব্ধ ছিল। সেই দিনে যে কী ঘটছে তা তিনি নিজেও সম্পূর্ণ জানেন নি, কেবল অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষ জানছিলেন।

সেই যে দীক্ষা সেদিন তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেটি সহজ ব্যাপার নয়। সে শুধু শান্তির দীক্ষা নয়, সে অগ্নির দীক্ষা। তাঁর প্রভু সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, 'এই-যে জিনিসটি তুমি আজ আমার হাত থেকে নিলে এটি যে সত্য— এর ভার যখন গ্রহণ করেছ তখন তোমার আর আরাম

নেই, তোমাকে রাত্রিদিন জাগ্রত থাকতে হবে। এই সত্যকে রক্ষা করতে তোমার যদি সমস্তই যায় তো সমস্তই যাক। কিন্তু সাবধান, তোমার হাতে আমার সত্যের অসম্মান না ঘটে।'

তাঁর প্রভুর কাছ থেকে এই সত্যের দান নিয়ে তার পরে আর তো তিনি ঘুমোতে পারেন নি। তাঁর আত্মীয় গেল, ঘর গেল, সমাজ গেল, নিন্দায় দেশ ছেয়ে গেল— এত বড়ো বৃহৎ সংসার, এত মানী বন্ধু, এত ধনী আত্মীয়, এত তাঁর সহায়, সমস্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেল এমন দীক্ষা তিনি নিয়েছিলেন। জগতের সমস্ত আনুকূল্যকে বিমুখ করে দিয়ে এই সত্যটি নিয়ে তিনি দেশে দেশে অরণ্যে পর্বতে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। এ যে প্রভুর সত্য। এই অগ্নি-রক্ষার ভার নিয়ে আর আরাম নেই, আর নিদ্রা নেই। রুদ্রদেবের সেই অগ্নিদীক্ষা আজকের দিনের উৎসবের মাঝখানে আছে। কিন্তু, সে কি প্রচ্ছন্নই থাকবে? এই গীতবাদ্য-কোলাহলের মাঝখানে প্রবেশ করে সেই 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং' যিনি তাঁর দীপ্ত সত্যের বজ্রমূর্তি আজ প্রত্যক্ষ করে যাবে না? গুরুর হাত হতে সেই যে 'বজ্রমুদ্যতং' তিনি গ্রহণ করেছিলেন এই ৭ই পৌষের মর্মস্থানে সেই বজ্রতেজ রয়েছে।

কিন্তু, শুধু বজ্র নয়, শুধু পরীক্ষা নয়, সেই দীক্ষার মধ্যে যে কী বরাভয় আছে তাও দেখে যেতে হবে। সেই ধনিসন্তানের জীবনে যে সংকটের দিন এসেছিল তা তো সকলের জানা আছে। যে বিপুল ঐশ্বর্য রাজহর্ম্যের মতো একদিন তাঁর আশ্রয় ছিল সেইটে যখন অকস্মাৎ তাঁর মাথার উপরে ভেঙে পড়ে তাঁকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার উদ্‌যোগ করেছিল তখন সেই ভয়ংকর বিপৎপতনের মাঝখানে একমাত্র এই সত্যদীক্ষা তাঁকে আবৃত করে রক্ষা করেছিল—সেই দিনে তাঁর আর-কোনো পার্থিব সহায় ছিল না। এই দীক্ষা শুধু যে দুর্দিনের দারুণ আঘাত থেকে তাঁকে

বাঁচিয়েছিল তা নয়— প্রলোভনের দারুণতর আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিল।

আজকের এই ৭ই পৌষের মাঝখানে তাঁর সেই সত্যদীক্ষার রুদ্রদীপ্তি এবং বরাভয়রূপ দুইই রয়েছে— সেটি যদি আমরা দেখতে পাই এবং লেশমাত্রও গ্রহণ করতে পারি তবে ধন্য হব। সত্যের দীক্ষা যে কাকে বলে আজ যদি ভক্তির সঙ্গে তাই স্মরণ করে যেতে পারি তা হলে ধন্য হব। এর মধ্যে ফাঁকি নেই, লুকোচুরি নেই, দ্বিধা নেই, দুই দিক বজায় রেখে চলবার চাতুরী নেই, নিজেকে ভোলাবার জন্যে সুনিপুণ মিথ্যাযুক্তি নেই, সমাজকে প্রসন্ন করবার জন্যে বুদ্ধির দুই চক্ষু অন্ধ করা নেই, মানুষের হাটে বিকিয়ে দেবার জন্যে ভগবানের ধন চুরি করা নেই। সেই সত্যকে সমস্ত দুঃখপীড়নের মধ্যে স্বীকার করে নিলে তার পরে একেবারে নির্ভয়, ধূলিঘর ভেঙে দিয়ে একেবারে পিতৃভবনের অধিকার-লাভ— চিরজীবনের যে গম্যস্থান, যে অমৃতনিকেতন, সেই পথের যিনি একমাত্র বন্ধু, তাঁরই আশ্রয়প্রাপ্তি— সত্যদীক্ষার এই অর্থ।

সেই সাধু সাধক তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো দিনটিকে, তাঁর দীক্ষার দিনটিকে, এই নির্জন প্রান্তরের মুক্ত আকাশ ও নির্মল আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই মহাদিনটির চারি দিকে এই মন্দির, এই আশ্রম, এই বিদ্যালয় প্রতিদিন আকার ধারণ করে উঠছে; আমাদের জীবন, আমাদের হৃদয়, আমাদের চেতনা একে বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছে; এই দিনটিরই আহ্বানে কল্যাণ মূর্তিমান হয়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছে; এবং তাঁর সেই সত্যদীক্ষার দিনটি ধনী ও দরিদ্রকে, বালক ও বৃদ্ধকে, জ্ঞানী ও মূর্খকে বর্ষে বর্ষে আনন্দ-উৎসবে আমন্ত্রণ করে আনছে। এই দিনটিকে যেন আমাদের অন্যমনস্ক জীবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে না রাখি— একে ভক্তিপূর্বক সমাদর করে ভিতরে ডেকে নাও,

আমাদের তুচ্ছ জীবনের প্রতিদিনের যে দৈন্য তাকে সম্পদে পূর্ণ করো।

হে দীক্ষাদাতা, হে গুরু, এখনো যদি প্রস্তুত হয়ে না থাকি তো প্রস্তুত করো, আঘাত করো, চেতনাকে সর্বত্র উদ্যত করো— ফিরিয়ে দিয়ো না, ফিরিয়ে দিয়ো না— দুর্বল ব'লে তোমার সভাসদ্‌দের সকলের পশ্চাতে ঠেলে রেখো না। এই জীবনে সত্যকে গ্রহণ করতেই হবে— নির্ভয়ে এবং অসংকোচে। অসত্যের স্তূপাকার আবর্জনার মধ্যে ব্যর্থ জীবনকে নিক্ষেপ করব না। দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে— তুমি শক্তি দাও।

১৩১৫

২

কবির কাব্যের মধ্যে যেমন কবির পরিচয় থাকে তেমনি এই-যে শান্তিনিকেতন আশ্রমটি তৈরি হয়ে উঠেছে, উঠেছে কেন, প্রতিদিনই তৈরি হয়ে উঠছে, এর মধ্যে একটি জীবনের পরিচয় আছে।

সেই জীবন কী চেয়েছিল এবং কী পেয়েছিল তা এই আশ্রমের মধ্যে যেমন করে লিখে গিয়েছে এমন আর-কোথাও লিখে যেতে পারে নি। অনেক বড়ো বড়ো রাজা তাম্রশাসনে শিলালিপিতে তাঁদের জয়লব্ধ রাজ্যের কথা ক্ষোদিত করে রেখে যান। কিন্তু এমন লিপি কোথায় পাওয়া যায়! এমন অবাধ মাঠে, এমন উদার আকাশে, এমন জীবনময় অক্ষর— এমন ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তনশীল নব নব বর্ণের লিপি!

মহর্ষি তাঁর জীবনে অনেক সভা স্থাপন করেছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনেক উপদেশ দিয়েছেন, অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সে-সমস্ত কাজের সঙ্গে তাঁর এই আশ্রমের একটি পার্থক্য আছে। যেমন গাছের ডাল থেকে খুঁটি হতে পারে, তাকে চিরে তার থেকে নানাপ্রকার জিনিস তৈরি হতে পারে, কিন্তু সেই গাছে যে ফুলটি ফোটে, যে ফলটি ধরে, সে এই-সমস্ত জিনিস থেকেই পৃথক, তেমনি মহর্ষির জীবনের অন্যান্য সমস্ত কর্মের থেকে এই আশ্রমের একটি বিশিষ্টতা আছে। এর জন্যে তাঁকে চিন্তা করতে হয় নি, চেষ্টা করতে হয় নি, বাইরের লোকের সঙ্গে মিলতে হয় নি, চার দিকের সঙ্গে কোনো ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয় নি। এ তাঁর জীবনের মধ্যে থেকে একটি মূর্তি ধরে আপনা-আপনি উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠেছে। এইজন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য, এমন একটি সম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। এইজন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুধাগন্ধ, এমন একটি মধুসঞ্চয়। এইজন্যেই এর মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ

যেমন সহজ, যেমন গভীর, এমন আর-কোথাও নেই।

এই আশ্রমে আছে কী? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চার দিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্রসূর্যগ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোটো বনটিতে ঋতুগুলি নিজের মেঘ আলো বর্ণ গন্ধ ফুল ফল— নিজের সমস্ত বিচিত্র আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। কোনো বাধার মধ্যে তাদের খর্ব হয়ে থাকতে হয় না। চার দিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝখানটিতে শান্তং-শিবমদ্বৈতমের দুই সন্ধ্যা নিত্য আরাধনা— আর কিছুই নয়। গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, উপনিষদের মন্ত্র পঠিত হচ্ছে, স্তব-গান ধ্বনিত হচ্ছে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর— সেই নিভৃতে, সেই নির্জনে, সেই বনের মর্মরে, সেই পাখির কূজনে, সেই উদার আলোকে, সেই নিবিড় ছায়ায়।

এই আশ্রমের মধ্যে থেকে দুটি সুর উঠেছে— একটি বিশ্বপ্রকৃতির সুর, একটি মানবাত্মার সুর। এই দুটি সুরধারার সংগমের মুখেই এই তীর্থটি স্থাপিত। এই দুটি সুরই অতি পুরাতন এবং চিরদিনই নূতন। এই আকাশ নিরন্তর যে নীরব মন্ত্র জপ করছে সে আমাদের পিতামহেরা আর্যাবর্তের সমতল প্রান্তরের উপরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কত শতাব্দী পূর্বেও চিত্তের গভীরতার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। এই-যে বনটির পল্লবঘন নিস্তব্ধতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে ছায়া এবং আলো দুই ভাই-বোনে মিলে পৃথিবীর উপরে নামাবলীর উত্তরীয় রচনা করছে, সেই পবিত্র শিল্পচাতুরী আমাদের বনবাসী আদিপুরুষেরা সেদিনও দেখেছেন যেদিন তাঁরা সরস্বতীর কূলে প্রথম কুটির নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছেন। এ সেই আকাশ, এ সেই ছায়ালোক, এ সেই অনির্বচনীয় একটি প্রকাশের ব্যাকুলতা,

যার দ্বারা সমস্ত শূন্যকে ক্রন্দিত করে শুনেছিলেন বলেই ঋষিপিতামহেরা এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী নাম দিয়েছিলেন।

আবার এখানে মানবের কণ্ঠ থেকে যে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে সেও কত যুগের প্রাচীন বাণী। পিতা নোঽসি! পিতা নোবোধি! নমস্তেঽস্তু— এই কথাটি কত সরল, কত পরিপূর্ণ এবং কত পুরাতন। যে ভাষায় এ বাণীটি প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল সে ভাষা আজ প্রচলিত নেই, কিন্তু এই বাক্যটি আজও বিশ্বাসে ভক্তিতে নির্ভরে ব্যগ্রতায় এবং বিনতিতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এই কটিমাত্র কথায় মানবের চিরদিনের আশা এবং আশ্বাস এবং প্রার্থনা ঘনীভূত হয়ে রয়ে গেছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম: এই অত্যন্ত ছোটো অথচ অত্যন্ত বড়ো কথাটি কোন্ সুদূর কালের! আধুনিক যুগের সভ্যতা তখন বর্বরতার গর্ভের মধ্যে গুপ্ত ছিল, সে ভূমিষ্ঠও হয় নি। কিন্তু অনন্তের উপলব্ধি আজও এই বাণীকে নিঃশেষ করতে পারে নি।

অসতোমা সদ্গময়! তমসোমা জ্যোতির্গময়! মৃত্যোর্মামৃতং গময়— এত বড়ো প্রার্থনা যেদিন নরকণ্ঠ হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সেদিনকার ছবি ইতিহাসের দূরবীক্ষণ দ্বারাও আজ স্পষ্টরূপে গোচর হয়ে ওঠে না। অথচ এই পুরাতন প্রার্থনাটির মধ্যে মানবাত্মার সমস্ত প্রার্থনা পর্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

এক দিকে এই পুরাতন আকাশ, পুরাতন আলোক এবং তরুলতার মধ্যে পুরাতন জীবনবিকাশের নিত্যনূতনতা, আর-এক দিকে মানবচিত্তের মৃত্যুহীন পুরাতন বাণী, এই দুইকে এক করে নিয়ে এই শান্তিনিকেতনের আশ্রম।

বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই দুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুইয়েরই মধ্যে এক রূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র, সেই

মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সারমন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী : ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

এক দিকে ভূলোক অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক, আর-এক দিকে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি, আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শক্তি বিকীর্ণ করছে, এই দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করছে, তাঁকে তাঁর এই শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী।

যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন, তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে এই গায়ত্রীমন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্র-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করছে—এই নিভৃতে মানুষের চিত্তকে প্রকৃতির প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত ক'রে, 'বরেণ্যং ভর্গ', সেই বরণীয় তেজকে, ধ্যানগম্য করে তুলছে।

এই গায়ত্রীমন্ত্রটি আমাদের দেশের অনেকেরই জপের মন্ত্র, কিন্তু এই মন্ত্রটি মহর্ষির ছিল জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ভিতর থেকে প্রকাশ করেছিলেন।

এই মন্ত্রটিকে তিনি যে গ্রহণ করেছিলেন এবং রক্ষা করেছিলেন লোকাচারের অনুসরণ তার কারণ নয়। হাঁস যেমন স্বভাবতই জলকে আশ্রয় করে তিনি তেমনি স্বভাবতই এই মন্ত্রটিকে অবলম্বন করেছিলেন।

শিশু যেমন মাতৃস্তন্যের জন্য কেঁদে ওঠে, তখন তাকে আর-কিছু দিয়েই থামিয়ে রাখা যায় না, তেমনি মহর্ষির হৃদয় একদিন তাঁর যৌবনারম্ভে

কী অসহ্য ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করে উঠেছিল সে কথা আপনারা সকলেই জানেন।

সে ক্রন্দন কিসের? চার দিকে তিনি কোন্ জিনিসটি কোনোমতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না? যখন আকাশের আলো তাঁর চোখে কালো হয়ে উঠেছিল, যখন তাঁর পিতৃগৃহের অতুল ঐশ্বর্যের আয়োজন এবং মানসম্ভ্রমের গৌরব তাঁর মনকে কোনোমতেই শান্তি দিচ্ছিল না, তখন তার যে কী প্রয়োজন, কী হলে তাঁর হৃদয়ের ক্ষুধা মেটে তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না।

ভোগবিলাসে তাঁর অরুচি জন্মে গিয়েছিল এবং তাঁর ভক্তিবৃত্তি নিজের চরিতার্থতা অন্বেষণ করছিল, কেবল এই কথাটুকুই সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ ভক্তিবৃত্তিকে ভুলিয়ে রাখবার আয়োজন কি তাঁর ঘরের মধ্যেই ছিল না? যে দিদিমার সঙ্গে তিনি ছায়ার মতো সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন তিনি জপতপ দানধ্যান পূজা-অর্চনা নিয়েই তো দিন কাটিয়েছেন; তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপেই শিশুকাল থেকেই মহর্ষি তাঁর সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন। যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হল, যখন ধর্মের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা জন্মাল, তখন এই অভ্যস্ত পথেই তাঁর সমস্ত মন কেন ছুটে গেল না? ভক্তিবৃত্তিকে ব্যাপৃত করে রাখবার উপকরণ তো তাঁর খুব নিকটেই ছিল।

তাঁর ভক্তিকে যে এই দিকে তিনি কখনো নিয়োজিত করেন নি তা নয়। তিনি যখন বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যেতেন পথিমধ্যে দেবী-মন্দিরে ভক্তিভরে প্রণাম করতে ভুলতেন না; তিনি একবার এত সমারোহে সরস্বতীর পূজা করেছিলেন যে সেবার পূজার দিনে শহরে গাঁদাফুল দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যেদিন শ্মশানঘাটে পূর্ণিমার রাতে তাঁর চিত্ত জাগ্রত হয়ে উঠল সেদিন এই-সকল চিরাভ্যস্ত পথকে তিনি পথ বলেই লক্ষ্য করলেন না। তাঁর তৃষ্ণার জল যে এ দিকে নেই তা বুঝতে তাঁকে

চিন্তামাত্র করতে হয় নি।

তাই বলছিলুম, ভক্তিকে বাইরের দিকে নিয়োজিত করে তিনি নিজেকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। অন্তঃপুরে তাঁর ডাক পড়েছিল। তিনি জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে, অন্তরাত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে আর কিছুতে ভুলিয়ে রাখে কার সাধ্য! যারা নানা ক্রিয়াকর্মে আপনাকে ব্যাপৃত রাখতে চায় তাদের নানা উপায় আছে, যারা ভক্তির মধুর রসকে আস্বাদন করতে চায় তাদেরও অনেক উপলক্ষ মেলে। কিন্তু যারা একেবারে তাঁকেই চেয়ে বসে, তাদের তো ওই একটি বই আর দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই। তারা কি আর বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে? তাদের সামনে কোনো রঙিন জিনিস সাজিয়ে তাদের কি কোনো-মতেই ভুলিয়ে রাখা যায়? নিখিলের মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে তাদের প্রবেশ করতেই হবে।

কিন্তু এই অধ্যাত্মলোকের— এই বিশ্বলোকের মন্দিরের পথ তাঁর চার দিকে যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্তরের ধনকে দূরে সন্ধান করবার প্রণালীই যে সমাজে চারি দিকে প্রচলিত ছিল। এই নির্বাসনের মধ্যে থেকেই তো তাঁর সমস্ত প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাঁর আত্মা যে আশ্রয় চাচ্ছিল সে আশ্রয় বাইরে খণ্ডতার রাজ্যে সে কোথায় খুঁজে পাবে?

আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে, জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে দেখতে হবে, এই কথাটি এতই অত্যন্ত সহজ যে হঠাৎ মনে হয় এ নিয়ে এত খোঁজাখুঁজি কেন, এত কান্নাকাটি কিসের জন্যে? কিন্তু বরাবর মানুষের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ঘটে এসেছে। মানুষের প্রবৃত্তি কিনা বাইরের দিকে ছোটবার জন্যে সহজেই প্রবণ, এই কারণে সেই ঝোঁকের মাথায় সে মূল কেন্দ্রের আকর্ষণ এড়িয়ে শেষে কোথায় গিয়ে পৌছয় তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে বাহ্যিকতাকেই দিনে দিনে এমনি বৃহৎ ও জটিল

করে দাঁড় করায় যে অবশেষে একদিন আসে যখন যা তার আন্তরিক, যা তার স্বাভাবিক, তাকেই খুঁজে বের করা তার পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। এত কঠিন হয় যে তাকে সে আর খোঁজেই না, তার কথা সে ভুলেই যায়, তাকে আর সত্য বলে উপলব্ধিই করে না; বাহ্যিকতাকেই একমাত্র জিনিস বলে জানে, আর-কিছুকে বিশ্বাসই করতে পারে না।

মেলার দিনে ছোটো ছেলে মার হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার মন কিনা চার দিকে, এইজন্যে মুঠো কখন সে ছেড়ে দেয়, তার পর থেকেই ভিড়ের মধ্যে, গোলমালের মধ্যে, কেবলই সে বাইরে থেকে বাইরে, দূরে থেকে দূরে চলে যেতে থাকে। ক্রমে মার কথা তার আর মনেই থাকে না, বাইরের যে-সমস্ত সামগ্রী সে দেখে সেইগুলিই তার সমস্ত হৃদয়কে অধিকার করে বড়ো হয়ে ওঠে। যে মা তার সব চেয়ে আপন তিনিই তার কাছে সব চেয়ে ছায়াময়, সব চেয়ে দূর হয়ে ওঠেন। শেষকালে এমন হয় যে অন্য সমস্ত জিনিসের মধ্যেই সে আহত প্রতিহত হয়ে বেড়ায়, কেবল নিজের মাকে খুঁজে পাওয়াই সন্তানের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের সেই দশা ঘটে।

এমন সময়ে এক-একজন মহাপুরুষ জন্মান যাঁরা সেই অনেকদিনকার হারিয়ে-যাওয়া স্বাভাবিকের জন্যে আপনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যার জন্যে চার দিকের কারো কিছুমাত্র দরদ নেই তারই জন্যে তাঁদের কান্না কোনো-মতেই থামতে চায় না। তাঁরা এক মুহূর্তে বুঝতে পারেন, আসল জিনিসটি আছে অথচ কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সেইটেই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস অথচ কেউ তার কোনো খোঁজ করছে না। জিজ্ঞাসা করলে, হয় হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে নয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আঘাত করতে আসছে।

এমনি করে যেটি সহজ, যেটি স্বাভাবিক, যেটি সত্য, যেটি না হলে নয়, পৃথিবীতে এক-একজন লোক আসেন সেটিকেই খুঁজে বের করতে। ঈশ্বরের এই এক লীলা, যেটি সব চেয়ে সহজ তাকে তিনি শক্ত করে তুলতে দেন। যা নিতান্তই কাছের তাকে তিনি হারিয়ে ফেলতে দেন, পাছে সহজ বলেই তাকে না দেখতে পাওয়া যায়, পাছে খুঁজে বের করতে না হলে তার সমস্ত তাৎপর্যটি আমরা না পাই। যিনি আমাদের অন্তরতর তাঁর মতো এত সহজ আর কী আছে? তিনি আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের চেয়ে সহজ, তবু তাঁকে আমরা হারাই সে কেবল তাঁকে আমরা খুঁজে বের করব বলেই। হঠাৎ যখন তিনি ধরা পড়েন, হঠাৎ যখন কেউ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে 'এই-যে এইখানেই', আমরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করি, 'কই? কোথায়?' এই-যে হৃদয়ের হৃদয়ে, এই-যে আত্মার আত্মায়। যেখানে তাঁকে পাওয়ার বড়োই দরকার সেইখানেই তিনি বরাবর বসে আছেন, কেবল আমরাই দূরে দূরে ছুটোছুটি করে মরছিলুম— এই সহজ কথাটি বোঝার জন্যেই, এই যিনি অত্যন্তই কাছে আছেন তাঁকেই খুঁজে পাবার জন্যে এক-একজন লোকের এত কান্নার দরকার। এই কান্না মিটিয়ে দেবার জন্যে যখনই তিনি সাড়া দেন তখনই ধরা পড়ে যান। তখনই সহজ আবার সহজ হয়ে আসে।

নিজের রচিত জটিল জাল ছেদন করে চিরন্তন আকাশ— চিরন্তন আলোকের অধিকার আবার ফিরে পাবার জন্য মানুষকে চিরকালই এইরকম মহাপুরুষদের মুখ তাকাতে হয়েছে। কেউ-বা ধর্মের ক্ষেত্রে, কেউ-বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কেউ-বা কর্মের ক্ষেত্রে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যা চিরদিনের জিনিস তাকে তাঁরা ক্ষণিকের আবরণ থেকে মুক্ত করবার জন্যে পৃথিবীতে আসেন। বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করা যায়, এই বিশ্বাসের অরণ্যে

যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয় : কোনো স্থানে গেলে, বা জলে স্নান করলে বা অগ্নিতে আহুতি দিলে, বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে, পথে পথে, ফিরতে হয়েছে। মানুষের হাতে এটি এতই কঠিন হয়ে উঠেছিল। য়িহুদিদের মধ্যে ফ্যারিসি-সম্প্রদায়ের অনুশাসনে যখন বাহ্য নিয়মপালনই ধর্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যখন তারা নিজের গণ্ডির বাইরে অন্য জাতি অন্য ধর্মপন্থীদের ঘৃণা করে তাদের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যখন য়িহুদির ধর্মানুষ্ঠান য়িহুদি-জাতিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল, তখন যিশু এই অত্যন্ত সহজ কথাটি বলবার জন্যেই এসেছিলেন যে, ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপুণ্য বাহিরের কৃত্রিম বিধিনিষেধের অনুগত নয় ; সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্মসাধনা হয় ; বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই অত্যন্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে 'হাঁ', কিন্তু তবুও এই কথাটিকেই সকল দেশেই মানুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে এর জন্যে যিশুকে মরুপ্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং ক্রুসের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

মহম্মদকেও সেই কাজ করতে হয়েছিল। মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে তিনি অন্তরের দিকে, অখণ্ডের দিকে, অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেন নি ; এর জন্যে

সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসংকুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, চারি দিকের শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চশক্তি-সম্পন্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়।

মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিন জন মহাপুরুষ সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্মকে দেশগত জাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্যের আলোকের মতো, মেঘের বারি-বর্ষণের মতো, সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁদের নাম করেছি। ধর্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না, এই কথাটি তাঁরা সর্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিখে দিয়ে গেছেন। দেশে দেশে কালে কালে সত্যের দুর্গম পথে কারা যে ঈশ্বরের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবন-প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভুল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব। সে প্রদীপটি কারো-বা ছোটো হতে পারে, কারো-বা বড়ো হতে পারে— সেই প্রদীপের আলো কারো-বা দিগ্‌দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে, কারো-বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে— কিন্তু সেই শিখাটিকে আর চেনা শক্ত নয়।

তাই বলছিলুম, মহর্ষি যে অত্যন্ত একটি সহজকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর চার দিকে তার কোনো সহায়তা ছিল না। সকলেই তাকে হারিয়ে বসেছিল, সে পথের চিহ্ন কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। সেইজন্যে যেখানে সকলেই নিশ্চিন্তমনে বিচরণ করছিল সেখানে

তিনি যেন মরুভূমির পথিকের মতো ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্য স্থির করবার জন্যে চারি দিকে তাকাচ্ছিলেন, মধ্যাহ্নের আলোকও তাঁর চক্ষে কালিমাময় হয়ে উঠেছিল এবং ঐশ্বর্যের ভোগায়োজন তাঁকে মৃগতৃষ্ণিকার মতো পরিহাস করছিল। তাঁর হৃদয় এই অত্যন্ত সহজ প্রার্থনাটি নিয়ে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে, 'পরমাত্মাকে আমি আত্মার মধ্যেই পাব, জগদীশ্বরকে আমি জগতের মধ্যেই দেখব, আর-কোথাও নয়, দূরে নয়, বাইরে নয়, নিজের কল্পনার মধ্যে নয়, অন্য দশজনের চিরাভ্যস্ত জড়তার মধ্যে নয়।' এই সহজ প্রার্থনার পথটিই চার দিকে এত বাধাগ্রস্ত এত কঠিন হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁকে এত খোঁজ খুঁজতে হয়েছে, এত কান্না কাঁদতে হয়েছে।

এ কান্না যে সমস্ত দেশের কান্না। দেশ আপনার চিরদিনের যে জিনিসটি মনের ভুলে হারিয়ে বসেছিল, তার জন্যে কোনোখানেই বেদনা বোধ না হলে সে দেশ বাঁচবে কী করে! চার দিকেই যখন অসাড়তা তখন এমন একটি হৃদয়ের আবশ্যক যার সহজ চেতনাকে সমাজের কোনো সংক্রামক জড়তা আচ্ছন্ন করতে পারে না। এই চেতনাকে অতি কঠিন বেদনা ভোগ করতে হয়, সমস্ত দেশের হয়ে বেদনা। যেখানে সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে সেখানে একলা তাকে হাহাকার বহন করে আনতে হয়, সমস্ত দেশের স্বাস্থ্যকে ফিরে পাবার জন্যে একলা তাকে কান্না জাগিয়ে তুলতে হয়; বোধহীনতার জন্যেই চারি দিকের জনসমাজ যে-সকল কৃত্রিম জিনিস নিয়ে অনায়াসে ভুলে থাকে, অসহ্য ক্ষুধাতুরতা দিয়ে তাকে জানাতে হয় প্রাণের খাদ্য তার মধ্যে নেই। যে দেশ কাঁদতে ভুলে গেছে, খোঁজবার কথা যার মনেও নেই, তার হয়ে একলা কাঁদা, একলা খোঁজা, এই হচ্ছে মহত্ত্বের একটি অধিকার। অসাড় দেশকে জাগাবার জন্যে যখন বিধাতার আঘাত এসে পড়তে থাকে তখন যেখানে চৈতন্য আছে

সেইখানেই সমস্ত আঘাত বাজতে থাকে, সেইখানকার বেদনা দিয়েই দেশের উদ্‌বোধন আরম্ভ হয়।

আমরা যাঁর কথা বলছি তাঁর সেই সহজচেতনা কিছুতেই লুপ্ত হয় নি, সেই তাঁর চেতনা চেতনাকেই খুঁজছিল, স্বভাবতই কেবল সেই দিকেই সে হাত বাড়াচ্ছিল, চার দিকে যে-সকল স্থূল জড়ত্বের উপকরণ ছিল তাকে সে প্রাণপণ বলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল— চৈতন্য না হলে চৈতন্য আশ্রয় পায় না যে।

এমন সময় এই অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে তাঁর সামনে উপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্র উড়ে এসে পড়ল। মরুভূমির মধ্যে পথিক যখন হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন অকস্মাৎ জলচর পাখিকে আকাশে উড়ে যেতে দেখে সে যেমন জানতে পারে তার তৃষ্ণার জল যেখানে সেখানকার পথ কোন্ দিকে, এই ছিন্ন পত্রটিও তেমনি তাঁকে একটি পথ দেখিয়ে দিলে। সেই পথটি সকলের চেয়ে প্রশস্ত এবং সকলের চেয়ে সরল, যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, জগতে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর ভিতর দিয়েই সে পথ চলে গিয়েছে, এবং সমস্তর ভিতর দিয়েই সেই পরম চৈতন্যস্বরূপের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে যিনি সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে রয়েছেন।

তার পর থেকে তিনি নদীপর্বত-সমুদ্রপ্রান্তরে যেখানেই ঘুরে বেড়িয়েছেন কোথাও আর তাঁর প্রিয়তমকে হারান নি, কেননা তিনি যে সর্বত্রই আর তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার ভিতরেই তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্বত্রই ব্যাপকভাবে দেখতে পাবার কত সুখ, যিনি বিশাল বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপরস-গীতগন্ধের নব নব রহস্যকে নিত্য নিত্য জাগিয়ে তুলে সমস্তকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন তাঁকেই আত্মার অন্তরতম নিভৃতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবার কত আনন্দ!

এই উপলব্ধি করার মন্ত্রই হচ্ছে গায়ত্রী। অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জানাই হচ্ছে এই মন্ত্রের সাধনা এবং এই সাধনাই ছিল মহর্ষির জীবনের সাধনা।

জীবনের এই সাধনাটিকে তিনি তাঁর উপদেশ ও বক্তৃতার মধ্যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সকলের চেয়ে সম্পূর্ণ সৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে শান্তিনিকেতন আশ্রমটির মধ্যে। কারণ, এই প্রকাশের ভার তিনি একলা নেন নি। এই প্রকাশের কাজে এক দিকে তাঁর ভগবৎ-পূজায়-উৎসর্গ-করা সমস্ত জীবনটি রয়ে গেছে ; আর-এক দিকে আছে সেই প্রান্তর, সেই আকাশ, সেই তরুশ্রেণী। এই দুই এখানে মিলিত হয়েছে— ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং ধিয়ঃ। এমনি করে গায়ত্রীমন্ত্র যেখানেই প্রত্যক্ষ-রূপ ধারণ করেছে, যেখানেই সাধকের মঙ্গলপূর্ণ চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য মিলিত হয়ে গেছে, সেইখানেই পুণ্যতীর্থ।

আমরা যারা এই আশ্রমে বাস করছি, হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, আজ উৎসবের শুভদিনে তোমার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা, তুমি আমাদের সেই চেতনাটি সর্বদা জাগিয়ে রেখে দাও যাতে আমরা যথার্থ তীর্থবাসী হয়ে উঠতে পারি। গ্রন্থের মধ্যে কীট যেমন তীক্ষ্ণ ক্ষুধার দংশনে গ্রন্থকে কেবল নষ্টই করে, তার সত্যকে লেশমাত্রও লাভ করে না, আমরাও যেন তেমনি করে নিজেদের অসংযত প্রবৃত্তিসকল নিয়ে এই আশ্রমের মধ্যে কেবল ছিদ্র বিস্তার করতে না থাকি, আমরা এর ভিতর-কার আনন্দময় সত্যটিকে যেন প্রতিদিন জীবনের মধ্যে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারি। আমরা যে সুযোগ যে অধিকার পেয়েছি অচেতন হয়ে কেবলই যেন তাকে নষ্ট করতে না থাকি। এখানে যে সাধকের চিত্তটি রয়েছে সে যেন আমাদের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে তোলে, যে মন্ত্রটি রয়েছে সে যেন আমাদের মননের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে ; আমরাও

যেন আমাদের জীবনটিকে এই আশ্রমের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে যেতে পারি যে, সেটি এখানকার পক্ষে চিরদিনের দানস্বরূপ হয়। হে আশ্রমদেব, দেওয়া এবং পাওয়া যে একই কথা। আমরা যদি নিজেকে না দিতে পারি তা হলে আমরা পাবও না, আমরা যদি এখান থেকে কিছু পেয়ে যাই এমন ভাগ্য আমাদের হয় তা হলে আমরা দিয়েও যাব—তা হলে আমাদের জীবনটি আশ্রমের তরুপল্লবের মর্মরধ্বনির মধ্যে চিরকাল মর্মরিত হতে থাকবে। এখানকার আকাশের নির্মল নীলিমার মধ্যে আমরা মিশব; এখানকার প্রান্তরের উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা বিস্তীর্ণ হব; আমাদের আনন্দ এখানকার পথিকদের স্পর্শ করবে, এখানকার অতিথিদের অভ্যর্থনা করবে। এখানে যে সৃষ্টিকার্যটি নিঃশব্দে চিরদিনই চলছে তারই মধ্যে আমরাও চিরকালের মতো ধরা পড়ে যাব। বৎসরের পর বৎসর যেমন আসবে, ঋতুর পর ঋতু যেমন ফিরবে, তেমনি এখানকার শালবনে ফুল ফোটার মধ্যে, পূর্বদিগন্তে মেঘ ওঠার মধ্যে, এই কথাটি চিরদিন ফিরে ফিরে আসবে, ঘুরে ঘুরে বেড়াবে যে : হে আনন্দময়, তোমার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি! হে সুন্দর, তোমার পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি! হে পবিত্র, তোমার শুভ্র হস্ত আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে! হে অন্তরের ধন, তোমাকে বাহিরে পেয়েছি! হে বাহিরের ঈশ্বর, তোমাকে অন্তরের মধ্যে লাভ করেছি!

হে ভক্তের হৃদয়ানন্দ, আমরা যে তোমাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারি নে তার একটিমাত্র কারণ এই, আমরা তোমার মতো হতে পারি নি। তুমি আত্মদা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি আপনাকে অজস্র দান করছ। আমরা স্বার্থ নিয়েই আছি, আমাদের ভিক্ষুকতা কিছুতেই ঘোচে না। আমাদের কর্ম, আমাদের ত্যাগ, স্বত-উচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্য থেকে উদ্‌বেল হয়ে উঠছে না। সেইজন্যে তোমার সঙ্গে আমাদের মিল হচ্ছে

না। আনন্দের টানে আপনি আমরা আনন্দস্বরূপের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারছি নে, আমাদের ভক্তি তাই সহজ ভক্তি হয়ে উঠছে না। তোমার যাঁরা ভক্ত তাঁরাই আমাদের এই অনৈক্যের সেতুস্বরূপ হয়ে তোমার সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে রেখে দেন; আমরা তোমার ভক্তদের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখতে পাই, তোমারই স্বরূপকে মানুষের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে লাভ করি। দেখি যে তাঁরা কিছু চান না, কেবল আপনাকে দান করেন; সে দান মঙ্গলের উৎস থেকে আপনিই উৎসারিত হয়, আনন্দের নির্ঝর থেকে আপনিই ঝরে পড়ে; তাঁদের জীবন চার দিকে মঙ্গললোক সৃষ্টি করতে থাকে, সেই সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি। এমনি করে তাঁরা তোমার সঙ্গে মিলেছেন। তাঁদের জীবনে ক্লান্তি নেই, ভয় নেই, ক্ষতি নেই; কেবলই প্রাচুর্য, কেবলই পূর্ণতা। দুঃখ যখন তাঁদের আঘাত করে তখনো তাঁরা দান করেন, সুখ যখন তাঁদের ঘিরে থাকে তখনো তাঁরা বর্ষণ করেন। তাঁদের মধ্যে মঙ্গলের এই রূপ যখন দেখতে পাই, আনন্দের এই প্রকাশ যখন উপলব্ধি করি তখন, হে পরমমঙ্গল পরমানন্দ, তোমাকে আমরা কাছে পাই; তখন তোমাকে নিঃসংশয় সত্য-রূপে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে তেমন অসাধ্য হয় না। ভক্তের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে তোমার যে মধুময় প্রকাশ, ভক্তের জীবনের উপর দিয়ে তোমার প্রসন্ন মুখের যে প্রতিফলিত স্নিগ্ধ রশ্মি, সেও তোমার জগদ্‌ব্যাপী বিচিত্র আত্মদানের একটি বিশেষ ধারা; ফুলের মধ্যে যেমন তোমার গন্ধ, ফলের মধ্যে যেমন তোমার রস, ভক্তের ভিতর দিয়েও তোমার আত্মদানকে আমরা যেন তেমনি আনন্দের সঙ্গে ভোগ করতে পারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই ভক্তিসুধা-সরস তোমার অতিমধুর লাবণ্য যেন আমরা না দেখে চলে না যাই। তোমার এই সৌন্দর্য তোমার কত ভক্তের জীবন থেকে কত রঙ নিয়ে যে মানবলোকের আনন্দকানন সাজিয়ে তুলেছে, তা যে দেখেছে

সেই মুগ্ধ হয়েছে। অহংকারের অন্ধতা থেকে যেন এই দেবদুর্লভ দৃশ্য হতে বঞ্চিত না হই। যেখানে তোমার একজন ভক্তের হৃদয়ের প্রেমস্রোতে তোমার আনন্দধারা একদিন মিলেছিল আমরা সেই পুণ্যসংগমের তীরে নিভৃত বনচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি; মিলনসংগীত এখনো সেখানকার সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে, সেখানকার নিশীথরাত্রের নিস্তব্ধতায় বেজে উঠছে। থাকতে থাকতে, শুনতে শুনতে, সেই সংগীতে আমরাও যেন কিছু সুর মিলিয়ে যেতে পারি এই আশীর্বাদ করো। কেননা, জগতে যত সুর বাজে তার মধ্যে এই সুরই সব চেয়ে গভীর, সব চেয়ে মিষ্ট—মিলনের আনন্দে মানুষের আত্মার এই গান, ভক্তিবীণায় এই তোমার অঙ্গুলির স্পর্শ, এই সোনার তারের মূর্ছনা।

১৩১৬

৩

এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারি দিকেই দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হোক, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্ছে না ; তাল, সে যত দুরূহ তালই হোক, কোনো জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই। চারি দিকেই গতি এবং স্ফূর্তি, স্পন্দন এবং নর্তন, অথচ সর্বত্রই অপ্রমত্ততা। পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে প্রবল বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, সূর্য প্রতি মুহূর্তে প্রবল বেগে কোনো-এক অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমাদের মনে ভাবনামাত্র নেই— আমরা সকালবেলায় নির্ভয়ে জেগে উঠে দিবসের তুচ্ছতম কাজটুকুও সম্পন্ন করবার জন্যে মনোযোগ করি এবং রাত্রে এ কথা নিশ্চয় জেনে শুতে যাই যে, দিবসের আয়োজনটি যেখানে যেমনভাবে আজ ছিল সমস্ত রাত্রির অন্ধকার ও অচেতনতার পরেও ঠিক তাকে সেই জায়গাতেই তেমনি করেই কাল পাওয়া যাবে। কেননা, সর্বত্র সামঞ্জস্য আছে ; এই অতি প্রকাণ্ড অপরিচিত জগৎকে আমরা এই বিশ্বাসেই প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাস করি।

অথচ এই সামঞ্জস্য তো সহজ সামঞ্জস্য নয়— এ তো মেষে ছাগে সামঞ্জস্য নয়, এ যেন বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ানো। এই জগৎক্ষেত্রে যে-সব শক্তির লীলা তাদের যেমন প্রচণ্ডতা, তেমনি তাদের বিরুদ্ধতা— কেউ বা পিছনের দিকে টানে, কেউ বা সামনের দিকে ঠেলে ; কেউ বা গুটিয়ে আনে, কেউ বা ছড়িয়ে ফেলে ; কেউ বা বজ্রমুষ্টিতে সমস্তকে তাল পাকিয়ে নিরেট করে ফেলবার জন্যে চাপ দিচ্ছে, কেউ বা তার চক্রযন্ত্রের প্রবল আবর্তে সমস্তকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দিগ্‌বিদিকে উড়িয়ে ফেলবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই-সমস্ত শক্তি অসংখ্য বেশে এবং

অসংখ্য তালে ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে— তার বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা আমাদের ধারণাশক্তির অতীত ; কিন্তু এই-সমস্ত প্রবলতা বিরুদ্ধতা বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোনো একটামাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি, কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই হচ্ছে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তংশিবমদ্বৈতম্। জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তম্, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।

আমাদের আত্মার যে সত্যসাধনা তার লক্ষ্যও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে, এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে— কখনোই প্রমত্ততার দিকে নয়। আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনোই প্রমত্ত নন ; নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপরম্পরার ভিতর দিয়ে অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল এই কথারই কেবল সাক্ষ্য দিচ্ছে : এষ সেতুর্বিধরণো লোকানামসম্ভেদায়।

এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্বাণের সাধনার আকার ধারণ করল। স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্বাণ শব্দটির অর্থ যে কী ছিল তা এখানে আলোচনা করে কোনো ফল নেই ; কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি, এই ধারণা বৌদ্ধযুগের পর হতে নানা আকারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এমনি করে পূর্ণতার শাস্তি একদিন শূন্যতার শাস্তি -আকারে ভারত-বর্ষের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে, তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়াল সেই দিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়াল— সেই দিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে, শরীরের প্রাণক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করে একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (Abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে, কিন্তু দেহমনহৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এরকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনোই প্রার্থনীয় হতে পারে না। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় বলে মনে করতেন তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে এই শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহ্বান করতেই পারতেন না— বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখতেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে-কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে আশ্রয় করত তাকে তাঁরা সকরুণ অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিতেন। যেখানে যেটা যেমনভাবে আছে ও চলছে তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক এই তাঁদের কথা ছিল, কারণ, সত্য মানুষের পক্ষে এতই সুদূর, এতই দুরধিগম্য, এবং সত্যকে পেতে গেলে নিজের স্বভাবকে মানুষের এমনি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিতে হয়!

দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের

সংসারযাত্রার মধ্যে, এত বড়ো একটা বিচ্ছেদ কখনোই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না। বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয় না— কি রাষ্ট্রতন্ত্রে, কি সমাজতন্ত্রে, কি ধর্মতন্ত্রে।

আমাদের দেশেও তাই হল। মানুষের সাধনাক্ষেত্র থেকে জ্ঞানী যে হৃদয়পদার্থকে অত্যন্ত জোর করে একেবারে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করে দিয়েছিল সেই হৃদয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই অধিকার-অনধিকারের বেড়া চুরমার করে ভেঙে বন্যার বেগে দেখতে দেখতে একেবারে চতুর্দিক প্লাবিত করে দিলে, অনেক দিন পরে সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন খুব ভরপুর হয়ে উঠল।

এখন আবার সকলে একেবারে উল্‌টো সুর এই ধরলে যে, হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতাই মানুষের সিদ্ধির চরম পরিচয়। হৃদয়বৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনার যে-সমস্ত দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ আছে সাধনায় সেগুলির প্রকাশই মানুষের কাছে একান্ত শ্রদ্ধালাভ করতে লাগল।

এই অবস্থায় স্বভাবত মানুষ আপনার ভগবানকেও প্রমত্ত আকারে দেখতে লাগল। তাঁর আর-সমস্তকেই খর্ব করে কেবলমাত্র তাঁকে হৃদয়াবেগচাঞ্চল্যের মধ্যেই একান্ত করে উপলব্ধি করতে লাগল এবং সেইরকম উপলব্ধি থেকে যে একটি নিরতিশয় ভাববিহ্বলতা জন্মায় সেইটেকেই উপাসনার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করে নিলে।

কিন্তু, ভগবানকে এইরকম করে দেখাও তাঁর সমগ্রতা থেকে তাঁকে অবচ্ছিন্ন করে দেখা। কারণ, মানুষ কেবলমাত্র হৃদয়পুঞ্জ নয়, এবং নানাপ্রকার উপায়ে শরীর-মনের সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ধারায় প্রবাহিত করতে থাকলে কখনোই সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হতে পারে না।

হৃদয়াবেগকেই চরমরূপে যখন প্রাধান্য দেওয়া হয় তখনি মানুষ এমন

কথা অনায়াসে বলতে পারে যে, ভক্তিপূর্বক মানুষ যাকেই পূজা করুক-না কেন, তাতেই তার সফলতা। অর্থাৎ, যেন পূজার বিষয়টি ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপায়মাত্র, যার একটা উপায়ে ভক্তি না জন্মে তাকে অন্য যা-হয় একটা উপায় জুগিয়ে দেওয়ায় যেন কোনো বাধা নেই। এই অবস্থায় উপলক্ষটা যাই হোক, ভক্তির প্রবলতা দেখলেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়— কারণ, প্রমত্ততাকেই আমরা সিদ্ধি বলে মনে করি।

এইরকম হৃদয়াবেগের প্রমত্ততাকেই আমরা অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ বলে মনে করি, তার কারণ আছে। যেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয় সেখানে শক্তিপুঞ্জ এক দিকে কাত হয়ে পড়ে বলেই তার প্রবলতা চোখে পড়ে। কিন্তু, সে তো এক দিক থেকে চুরি করে অন্য দিককে স্ফীত করা। যে দিক থেকে চুরি হয় সে দিক থেকে নালিশ ওঠে; তার শোধ দিতেই হয় এবং তার শাস্তি না পেয়ে নিষ্কৃতি হয় না। সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চায় মানুষ কখনোই মনুষ্যত্ব লাভ করে না এবং মনুষ্যত্বের যিনি চরম লক্ষ্য তাঁকেও লাভ করতে পারে না।

নিজের মনের ভক্তির চরিতার্থতাই যখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল, বস্তুত দেবতা যখন উপলক্ষ হয়ে উঠলেন এবং ভক্তিকে ভক্তি করাই যখন নেশার মতো ক্রমশই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল— মানুষ যখন পূজা করবার আবেগটাকেই প্রার্থনা করলে, কাকে পূজা করতে হবে সে দিকে চিন্তামাত্র প্রয়োগ করলে না, এবং এই কারণেই যখন তার পূজার সামগ্রী দ্রুতবেগে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ভাবে নানা আকার ও নানা নাম ধরে অজস্র অপরিমিত বেড়ে উঠল এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার নানা কাহিনী নানা আচার-বিচার জড়িত বিজড়িত হয়ে উঠতে

লাগল— জগদ্ব্যাপারের সর্বত্রই একটা জ্ঞানের ন্যায়ের নিয়মের অমোঘ ব্যবস্থা আছে এই ধারণা যখন চতুর্দিকে ধূলিসাৎ হতে চলল— তখন সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

একদা বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন নিরর্থক কর্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল; কেবল নানা জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র পড়ে, কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল; তখন মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানই দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়াল। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল— কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান-নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বললেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্মই চূড়ান্ত ছিল; জ্ঞান ও হৃদ্‌বৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করে নি, তার পরে যখন জ্ঞান বড়ো হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম উভয়কে নির্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়াল তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটি সম্পূর্ণ জুড়ে বসল; দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোটো করে দিলে, এমন-কি, ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণগুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।

এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্যন্ত

নিজের প্রকৃতির একাংশের তৃপ্তি-সাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার সর্বাংশের ক্ষুধা একদিন না জেগে উঠে থাকতে পারে না।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এ দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়; ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তং-শিবমদ্বৈতম্, সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্বসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কিরকম প্রবল এবং তাকে আপনার মধ্যে কিরকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।

তাঁর স্নেহময়ী দিদিমার মৃত্যুশোকের আঘাতে মহর্ষির ধর্মজীবন প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেই যে ক্ষুধার কান্না কেঁদেছে তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব আছে।

শিশু যখন খেলবার জন্যে কাঁদে তখন হাতের কাছে যে-কোনো একটা খেলনা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রাখা সহজ, কিন্তু সে যখন মাতৃস্তন্যের জন্যে কাঁদে তখন তাকে আর-কিছু দিয়েই ভোলাবার উপায় নেই। যে লোক নিজের বিশেষ একটা হৃদয়াবেগকে কোনো একটা-কিছুতে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রমাত্র চায় তাকে থামিয়ে রাখবার জিনিস জগতে অনেক আছে—কিন্তু কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগ যার লক্ষ্য নয়, যে সত্য চায়, সে তো ভুলতে চায় না, সে পেতে চায়। কাজেই সত্য কোথায় পাওয়া যাবে এই সন্ধানে তাকে সাধনার পথে বেরোতেই হবে—তাতে বাধা আছে, দুঃখ আছে, তাতে বিলম্ব ঘটে, তাতে আত্মীয়েরা বিরোধী

হয়, সমাজের কাছ থেকে আঘাত বর্ষিত হতে থাকে ; কিন্তু উপায় নেই, তাকে সমস্তই স্বীকার করতে হয়।

এই-যে সত্যকে পাবার ইচ্ছা এ কেবল জিজ্ঞাসামাত্র নয়, কেবল জ্ঞানে পাবার ইচ্ছা নয়, এর মধ্যে হৃদয়ের দুঃসহ ব্যাকুলতা আছে— তাঁর ছিল সত্যকে কেবল জ্ঞানরূপে নয়, আনন্দরূপে পাবার বেদনা। এইখানে তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যকে চাচ্ছিল। আমাদের দেশে এক সময়ে বলেছিল, ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থান নেই এবং ভক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্থান নেই, কিন্তু মহর্ষি ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং ভক্তিতে, অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে তাঁকে চেয়েছিলেন —এইজন্যে ক্রমাগত নানা কষ্ট নানা চেষ্টা নানা গ্রহণবর্জনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে যতক্ষণ তাঁর চিত্ত তাঁর অমৃতময় ব্রহ্মে, তাঁর আনন্দের ব্রহ্মে, গিয়ে না ঠেকেছিল ততক্ষণ একমুহূর্ত তিনি থামতে পারেন নি।

এই কারণে তাঁর জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান একটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল এই যে, সে জ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে না ধরে তিনি ক্ষান্ত হন নি।

জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানের গণ্ডির মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সেই-জন্যেই এ দেশের লোকে অনেক সময়েই বলে থাকে, ব্রহ্মজ্ঞানের আবার প্রচার কী।

কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি এ কথা বুঝেছেন, ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়— শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায়, কেননা সমস্ত রসের সার তিনি : রসো বৈ সঃ। যিনি হৃদয় দিয়ে ব্রহ্মকে পেয়েছেন তিনি উপনিষদের এই মহাবাক্যের অর্থ বুঝেছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্য প্রকাশ করতে চায় তখন বারবার ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা— মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।

আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে; সে গণ্ডির মধ্যে আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে এ কথা কাউকে বলে না যে 'তুমি দুর্বল, তোমার সাধ্য নেই'। কেননা, আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয়— আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত করে, এতই নিবিড় করে দেখে যে, সে তাঁকে দুষ্প্রাপ্য বলে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না; পথ যত দীর্ঘ যত দুর্গম হোক-না, এই পরমলাভের কাছে সে কিছুই নয়।

এই কারণে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে-কোনো মহাত্মা আনন্দ দিয়ে তাঁকে লাভ করেছেন তাঁরা অমৃতভাণ্ডারের দ্বার বিশ্বজনের কাছে খুলে দেবার জন্যেই দাঁড়িয়েছেন; আর যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র আচারের মধ্যে নিবিষ্ট তাঁরাই পদে পদে ভেদ-বিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করে দেন। তাঁরা কেবল না'এর দিক থেকে সমস্ত দেখেন, হাঁ'এর দিক থেকে নয়— এইজন্যে তাঁদের ভরসা নেই, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং ব্রহ্মকেও তাঁরা নিরতিশয় শূন্যতার মধ্যে নির্বাসিত করে রেখে দেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যখন ধর্মের ব্যাকুলতা প্রবল হল তখন তিনি যে অনন্ত নেতি-নেতিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু তিনি যে সেই ব্যাকুলতার বেগে সমাজের ও পরিবারের চিরসংস্কারগত অভ্যস্ত পথে তাঁর ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করে দিয়ে

কোনোমতে তার কান্নাকে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন নি এইটেই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কাকে চাচ্ছেন তা ভালো করে জানবার পূর্বেই তাঁকেই চেয়েছিলেন— জ্ঞান যাঁকে চিরকালই জানতে চায় এবং প্রেম যাঁকে চিরকালই পেতে থাকে।

এইজন্য জীবনের মধ্যে তিনি সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করলেন— পরিমিত পদার্থের মতো করে যাঁকে পাওয়া যায় না এবং শূন্যপদার্থের মতো যাঁকে না-পাওয়া যায় না— যাঁকে পেতে গেলে এক দিকে জ্ঞানকে খর্ব করতে হয় না, অন্য দিকে প্রেমকে উপবাসী করে মারতে হয় না— যিনি বস্তু-বিশেষের দ্বারা নির্দিষ্ট নন অথবা বস্তুশূন্যতার দ্বারা অনির্দিষ্ট নন— যাঁর সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন যে 'যে তাঁকে বলে আমি জানি সেও তাঁকে জানে না, যে বলে আমি জানি নে সেও তাঁকে জানে না'— এক কথায় যাঁর সাধনা হচ্ছে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা।

যাঁরা মহর্ষির জীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন, ভগবৎপিপাসা যখন তাঁর প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তখন কিরকম দুঃসহ বেদনার মধ্যে তাঁর হৃদয়কে তরঙ্গিত করে তুলেছিল। অথচ তিনি যখন ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদ করতে লাগলেন তখন তাঁকে উদ্দাম ভাবোন্মাদে আত্মবিস্মৃত করে দেয় নি। কারণ, তিনি যাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি শান্তম্-শিবম্-অদ্বৈতম্— তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত প্রেম অতলস্পর্শ পরিপূর্ণতায় পর্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর মধ্যে বিশ্বচরাচর শক্তিতে ও সৌন্দর্যে নিত্যকাল তরঙ্গিত হচ্ছে— সে তরঙ্গ সমুদ্রকে ছাড়িয়ে চলে যায় না, এবং সমুদ্র সেই তরঙ্গের দ্বারা আপনাকে উদ্‌বেল করে তোলে না। তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বলেই শক্তির সংযম এমন অটল, অনন্ত রস বলেই রসের গাম্ভীর্য এমন অপরিমেয়।

এই শক্তির সংযমে, এই রসের গাম্ভীর্যে মহর্ষি চিরদিন আপনাকে

ধারণ করে রেখেছিলেন ; কারণ, ভূমার মধ্যেই আত্মাকে উপলব্ধি করবার সাধনা তাঁর ছিল। যাঁরা আধ্যাত্মিক অসংযমকেই আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন তাঁরা এই অবিচলিত শান্তির অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে কল্পনা করেন— তাঁরা প্রমত্ততার মধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়াকেই ভক্তির চরম অবস্থা বলে জানেন। কিন্তু যাঁরা মহর্ষিকে কাছে থেকে দেখেছেন, বস্তুত যাঁরা কিছুমাত্র তাঁর পরিচয় পেয়েছেন, তাঁরা জানেন যে, তাঁর প্রবল সংযম ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য ভক্তিরসের দীনতাজনিত নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন, তেমনি পারস্যের সৌন্দর্যকুঞ্জের বুলবুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনের আনন্দপ্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কিরকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।

ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেমনি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলই রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, আর-সমস্তের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং কর্মের বন্ধনমাত্রকে অসহ্য বলে বোধ হয়। অর্থাৎ, মনুষ্যত্বের কেবল একটিমাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্য সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি এবং অন্য সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।

ভগবৎলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও এইরকম সামঞ্জস্যচ্যুত বৈরাগ্য মহর্ষির চিত্তকে কোনোদিন অধিকার করে নি। তিনি সংসারকে

ত্যাগ করেন নি, সংসারের সুরকে ভগবানের ভক্তিতে বেঁধে তুলেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে দেখবে, উপনিষদের এই উপদেশ-বাক্য-অনুসারে তিনি তাঁর সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ ও বিচিত্র কর্মকে ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত করে দেখবার তপস্যা করেছিলেন। কেবল নিজের পরিবার নয়, জনসমাজের মধ্যেও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে তিনি চিরজীবন চেষ্টা করেছেন। এইজন্য এই শান্তি-নিকেতনের বিশাল প্রান্তরের মধ্যেই হোক আর হিমালয়ের নিভৃত গিরিশিখরেই হোক, নির্জন সাধনায় তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে নি। তাঁর ব্রহ্ম একলার ব্রহ্ম নয়, তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম—নির্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা; অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব-উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই-যে পরিপূর্ণ-স্বরূপ ব্রহ্ম, সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্ছে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গেই যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া—দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা—অর্থাৎ, পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের দ্বারা একেই নির্দেশ করেছিলেন।

ব্রহ্মের উপাসনা কাকে বলে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব। তাঁতে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁর উপাসনা। এ কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশে ইতিপূর্বে তাঁর প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্যসাধন এই

উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। অন্তত প্রিয়কার্য শব্দের অর্থকে আমরা অত্যন্ত সংকীর্ণ করে এনেছিলুম; ব্যক্তিগত শুচিতা এবং কতকগুলি আচার-পালনকেই আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য বলে স্থির করে রেখেছিলুম। কর্ম যেখানে দুঃসাধ্য, যেখানে কঠোর, কর্মে যেখানে যথার্থ বীর্যের প্রয়োজন, যেখানে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, যেখানে অমঙ্গলের কণ্টকতরুকে রক্তাক্ত হস্তে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যেখানে অপমান নিন্দা নির্যাতন স্বীকার ক'রে প্রাচীন অভ্যাসের স্থূল জড়ত্বকে কঠিন দুঃখে ভেদ ক'রে জনসমাজের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেই দিকে আমরা দেবতার উপাসনাকে স্বীকার করি নি। দুর্বলতাবশতই এই পূর্ণ উপাসনায় আমাদের অনাস্থা ছিল এবং অনাস্থা ছিল বলেই আমাদের দুর্বলতা এপর্যন্ত কেবলই বেড়ে এসেছে। ভগবানের প্রতি প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্যসাধনের মাঝখানে আমাদের চরিত্রের মজ্জাগত দুর্বলতা যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে দেবার পথে একদিন মহর্ষি একলা দাঁড়িয়েছিলেন— তখন তাঁর মাথার উপরে বৈষয়িক বিপ্লবের প্রবল ঝড় বইতেছিল এবং চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন পরিবার ও বিরুদ্ধ সমাজের সর্বপ্রকার আঘাত এসে পড়ছিল, তারই মাঝখানে অবিচলিত শক্তিতে একাকী দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাক্যে ও ব্যবহারে এই মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন: তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভারতবর্ষ তার দুর্গতিদুর্গের যে রুদ্ধ দ্বারে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাপন করেছে— আপনার ধর্মকে সমাজকে, আপনার আচারব্যবহারকে কেবলমাত্র আপনার কৃত্রিম গণ্ডির মধ্যে বেষ্টিত করে বসে রয়েছে— সেই দ্বার বাইরের পৃথিবীর প্রবল আঘাতে আজ ভেঙে গেছে। আজ আমরা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছি, সকলের সঙ্গে আজ আমাদের নানাপ্রকার ব্যবহারে আসতে হয়েছে। আজ আমাদের যেখানে চরিত্রের

দীনতা, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, হৃদয়ের সংকোচ, যেখানে যুক্তিহীন আচারের দ্বারা আমাদের শক্তিপ্রয়োগের পথ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠছে, যেখানেই লোকব্যবহারে ও দেবতার উপাসনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ভেদ্য ব্যবধানে আমাদের শতখণ্ড করে দিচ্ছে, সেইখানেই আমাদের আঘাতের পর আঘাত, লজ্জার পর লজ্জা পেতে হচ্ছে— সেইখানেই অকৃতার্থতা বারম্বার আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে এবং সেইখানেই প্রবল-বেগে-চলনশীল মানবস্রোতের অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে আমরা মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছি। এইরকম সময়েই যে-সকল মহাপুরুষ আমাদের দেশে মঙ্গলের জয়ধ্বজা বহন করে আবির্ভূত হবেন তাঁদের ব্রতই হবে জীবনের সাধনার ও সিদ্ধির মধ্যে সত্যের সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যকে সমুজ্জ্বল করে তোলা যাতে ক'রে এখানকার জনসমাজের সেই সাংঘাতিক বিশ্লিষ্টতা দূর হবে— যে বিশ্লিষ্টতা এ দেশে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, আচারের সঙ্গে ধর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচারশক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রবল বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে শতজীর্ণ করে ফেলছে।

ধনীগৃহের প্রচুর বিলাসের আয়োজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং আচারনিষ্ঠ সমাজের কুলক্রমাগত প্রথার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষি নিজের বিচ্ছেদকাতর আত্মার মধ্যে এই সামঞ্জস্য-অমৃতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন; নিজের জীবনে চিরদিন সমস্ত লাভক্ষতি সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাহিরে সমস্ত বাধাবিরোধের মধ্যে 'শান্তংশিবমদ্বৈতম্' এই সামঞ্জস্যের মন্ত্রটি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবনের অবসান পর্যন্ত এই দেখা গেছে যে তাঁর চিত্ত কোনো বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল না— ঘরে বাইরে, শয়নে আসনে, আহারে ব্যবহারে, আচারে অনুষ্ঠানে, কিছুতেই তাঁর

লেশমাত্র শৈথিল্য বা অমনোযোগ ছিল না। কি গৃহকর্মে কি বিষয়-কর্মে, কি সামাজিক ব্যাপারে কি ধর্মানুষ্ঠানে, সুনিয়মিত ব্যবস্থার স্খলন তিনি কোনো কারণেই অল্পমাত্রও স্বীকার করতেন না; সমস্ত ব্যাপারকেই তিনি ধ্যানের মধ্যে সমগ্রভাবে দেখতেন এবং একেবারে সর্বাঙ্গীণভাবে সম্পন্ন করতেন— তুচ্ছ থেকে বৃহৎ পর্যন্ত যা-কিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল তার কোনো অংশই তিনি নিয়মের ব্যভিচার বা সৌন্দর্যের বিকৃতি সহ্য করতে পারতেন না। ভাষায় বা ভাবে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র ওজন নষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আঘাত করত। তাঁর মধ্যে যে দৃষ্টি, যে ইচ্ছা, যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তা ছোটো-বড়ো এবং আন্তরিক-বাহ্যিক কিছুকেই বাদ দিত না; সমস্তকেই ভাবের মধ্যে মিলিয়ে, নিয়মের মধ্যে বেঁধে, কাজের মধ্যে সম্পন্ন ক'রে তুলে, তবে স্থির হতে পারত। তাঁর জীবনের অবসান পর্যন্ত দেখা গেছে, তাঁর ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানবিক কোনো বিষয়কেই অবজ্ঞা করে নি— সর্বত্রই তাঁর ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাল্যকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ড্যালহৌসি পর্বতে একবার গিয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, এক দিকে যেমন তিনি অন্ধকার রাত্রে শয্যাত্যাগ করে পার্বত্য গৃহের বারান্দায় একাকী উপাসনার আসনে বসতেন, ক্ষণে ক্ষণে উপনিষৎ ও ক্ষণে ক্ষণে হাফেজের গান গেয়ে উঠতেন, দিনের মধ্যে থেকে থেকে ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, সন্ধ্যাকালে আমার বালককণ্ঠের ব্রহ্মসংগীত শ্রবণ করতেন, তেমনি আবার জ্ঞান-আলোচনার সহায়স্বরূপ তাঁর সঙ্গে প্রক্টরের তিনখানি জ্যোতিষ্কসম্বন্ধীয় বই, কাণ্টের দর্শন ও গিবনের 'রোমের ইতিহাস' ছিল— তা ছাড়া এ দেশের ও ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র হতে তিনি জ্ঞানে ও কর্মে বিশ্বপৃথিবীতে মানুষের যা-কিছু পরিণতি ঘটছে সমস্তই মনে-মনে পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিত্তের এই সর্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসারযাত্রায় ও ধর্মকর্মে সর্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন

হতে নিয়ত রক্ষা করেছে, গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে এবং এই সামঞ্জস্যবোধ চিরন্তন সঙ্গীরূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয় নি। এই সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা তাঁর মনে সর্বদা কিরকম জাগ্রত ছিল তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব। তখন তিনি অসুস্থ শরীরে পার্ক স্ট্রীটে বাস করতেন—একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটী থেকে তিনি আমাকে পার্ক স্ট্রীটে ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'দেখো, আমার মৃত্যুর পরে আমার চিতাভস্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনে সমাধিস্থাপনের একটি প্রস্তাব আমি শুনেছি; কিন্তু তোমার কাছে আমি বিশেষ করে বলে যাচ্ছি, কদাচ সেখানে আমার সমাধিরচনা করতে দেবে না।' আমি বেশ বুঝতে পারলুম, শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে ধ্যানমূর্তি তাঁর মনের মধ্যে বিরাজ করছিল, সেখানে তিনি যে শান্ত-শিব-অদ্বৈতের আবির্ভাবকে পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখতে পাচ্ছিলেন, তার মধ্যে তাঁর নিজের সমাধিস্তম্ভের কল্পনা সমগ্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্যকে সূচিবিদ্ধ করছিল—সেখানে তাঁর নিজের কোনো স্মরণচিহ্ন আশ্রমদেবতার মর্যাদাকে কোনোদিন পাছে লেশমাত্র অতিক্রম করে, সেদিন মধ্যাহ্নে এই আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাকতে দেয় নি।

এই সাধক যে অসীম শান্তিকে আশ্রয় ক'রে আপনার প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় জীবনান্তকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই শান্তি তুমি, হে শান্ত, হে শিব! ভক্তের জীবনের মধ্য হতে তোমার সেই শান্তস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে আমাদের জীবনে আজ প্রতিফলিত হোক। তোমার সেই শান্তিই সমস্ত ভুবনের প্রতিষ্ঠা, সকল বলের আধার। অসংখ্যবহুধা শক্তি তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তি হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীম আকাশে অনাদি অনন্ত কালে বিকীর্ণ পরিকীর্ণ হয়ে পড়ছে

এবং এই অসংখ্যবহুধা শক্তি সীমাহীন দেশকালের মধ্য দিয়ে তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ লাভ করছে। সকল শক্তি সকল কর্ম সকল প্রকাশের আধার তোমার এই প্রবল বিপুল শান্তি আমাদের এই নানা-ক্ষুদ্রতায়-চঞ্চল বিরোধে-বিচ্ছিন্ন বিভীষিকায়-ব্যাকুল দেশের উপরে নব নব ভক্তের বাণী ও সাধকের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হোক। কৃষক যেখানে অলস এবং দুর্বল, যেখানে সে পূর্ণ উদ্যমে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করে না, সেইখানেই শস্যের পরিবর্তে আগাছায় দেখতে দেখতে চারি দিক ভরে যায়, সেইখানেই বেড়া ঠিক থাকে না, আল নষ্ট হয়ে যায়, সেইখানেই ঋণের বোঝা ক্রমশই বেড়ে উঠে বিনাশের দিন দ্রুত বেগে এগিয়ে আসতে থাকে— আমাদের দেশেও তেমনি করে দুর্বলতার সমস্ত লক্ষণ ধর্মসাধনায় ও কর্মসাধনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে; উচ্ছৃঙ্খল কাল্পনিকতা ও যুক্তিবিচারহীন আচারের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্র, আমাদের মঙ্গলের পথ, সর্বত্রই একান্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে; সকল-প্রকার অদ্ভুত অমূলক অসংগত বিশ্বাস অতি সহজেই আমাদের চিত্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে ফেলছে; নিজের দুর্বল বুদ্ধি ও দুর্বল চেষ্টায় আমরা নিজে যেমন ঘরে বাহিরে সকল-প্রকার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে পদে পদেই নিয়মের স্খলন ও অব্যবস্থার বীভৎসতাকে জাগিয়ে তুলি তেমনি তোমার এই বিশাল বিশ্বব্যাপারেও আমরা সর্বত্রই নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছাচারিতা কল্পনা করি, অসম্ভব বিভীষিকা সৃজন করি— সেইজন্যই কোনোপ্রকার অন্ধ সংস্কারে আমাদের কোথাও বাধা নেই, তোমার চরিতে ও অনুশাসনে আমরা উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতার আরোপ করতে সংকোচমাত্র বোধ করি নে এবং আমাদের সর্বপ্রকার চিরপ্রচলিত আচারবিচারে মূঢ়তার এমন কোনো সীমা নেই যার থেকে কোনো যুক্তিতর্কে কোনো শুভবুদ্ধি দ্বারা আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। সেইজন্যে

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

আমরা দুর্গতির ভয়সংকুল সুদীর্ঘ অমাবস্যার রাত্রিতে দুঃখদারিদ্র্য-অপমানের ভিতর দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে কেবলই নিজের অন্ধতার চারি দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হে শান্ত, হে মঙ্গল, আজ আমাদের পূর্বাকাশে তোমার অরুণরাগ দেখা দিয়েছে, আলোকবিকাশের পূর্বেই দুটি-একটি ক'রে ভক্তবিহঙ্গ জাগ্রত হয়ে সুনিশ্চিত পঞ্চমস্বরে আনন্দবার্তা ঘোষণা করছে ; আজ আমরা দেশের নব উদ্‌বোধনের এই ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গল পরিণামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শিরোধার্য করে নিয়ে তোমার জ্যোতির্ময় কল্যাণসূর্যের অভ্যুদয়ের অভিমুখে নবীন প্রাণে নবীন আশায় তোমাকে আনন্দময় অভিবাদনে নমস্কার করি।

১৩১৭

আমাদের আশ্রমের উৎসবের ভিতরকার তত্ত্বটি কী তাই আজ আমাদের বিশেষ করে জানবার দিন। যে মহাত্মা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজ তাঁরই দীক্ষাদিনের সাম্বৎসরিক। আজকের এই উৎসবটি তাঁর জন্মদিনের বা মৃত্যুদিনের উৎসব নয়। তাঁর দীক্ষাদিনের উৎসব। তাঁর এই দীক্ষার কথাই এই আশ্রমের ভিতরকার কথা।

সকলেই জানেন যে, এক সময়ে যখন তিনি যৌবনবয়সে বিলাসের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছিলেন তখন হঠাৎ তাঁর পিতামহীর মৃত্যু হওয়াতে তাঁর অন্তরে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হল। সেই বেদনার আঘাতে চারি দিক থেকে আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেল। যে সত্যের জন্যে তাঁর হৃদয় লালায়িত হল তাকে তিনি কোথায় পাবেন, তাকে কেমন করে পাবেন, এই ভেবে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার চারি দিকে যে-সকল অভ্যাস রয়েছে, যে-সব প্রথা চিরকাল চলে আসছে, তারই মধ্যে বেশ আরামে থাকে— যতক্ষণ পর্যন্ত ভিতরে যে সত্য রয়েছে তা তার অন্তরে জাগ্রত না হয়— ততক্ষণ তার এই বেদনাবোধ থাকে না। যেমন, যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখন ছোটো খাঁচায় ঘুমোলেও কষ্ট হয় না, কিন্তু জেগে উঠলে আর সেই খাঁচার মধ্যে থাকতে পারি না। তখন সংকীর্ণ জায়গাতে আর আমাদের কুলোয় না। ধনমান যখন আমাদের বেষ্টন করে থাকে তখন তো আমাদের কোনো অভাব বোধ হয় না। আমরা সংসারে বেশ আরামে আছি এই মনে করেই নিশ্চিন্ত থাকি। শুধু ধনমান কেন, পুরুষানুক্রমে যে-সব বিধিব্যবস্থা আচারবিচার চলে আসছে তার মধ্যেও নিবিষ্ট থাকলে মনে হয়, 'এ বেশ— আর নতুন কোনো চিন্তা বা চেষ্টা

করবার দরকার নেই।' কিন্তু, একবার যথার্থ সত্যের পিপাসা জাগ্রত হলে দেখতে পাই যে সংসারই মানুষের শেষ জায়গা নয়। আমরা যে ধুলোয় জন্মে ধুলোয় মিশব তা নয়। জীবন-মৃত্যুর চেয়ে অনেক বড়ো আমাদের আত্মা। সেই আত্মা উদ্‌বোধিত হলে বলে ওঠে, 'কী হবে আমার এই চিরকালের অভ্যাস নিয়ে, আচার নিয়ে! এ তো আমার নয়। এতে আরাম আছে, এতে কোনো ভাবনাচিন্তা নেই, এতেই সংসার চলে যাচ্ছে তা জানি। কিন্তু, এ আমার নয়।' সংসারের পনেরো-আনা লোক যেমন ধনমানে বেষ্টিত হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আছে, তেমনি যে-সমস্ত আচারবিচার চলে আসছে তারও মধ্যে তারা আরামে রয়েছে। কিন্তু, একবার যদি কোনো আঘাতে এই আবরণ ছিন্ন হয়ে যায় অমনি মনে হয়, এ কী কারাগার! এ আবরণ তো আশ্রয় নয়।

এক-একজন লোক সংসারে আসেন যাঁদের কোনো আবরণে আবদ্ধ করতে পারে না। তাঁদের জীবনেই বড়ো বড়ো আঘাত এসে পৌঁছয় আবরণ ভাঙবার জন্যে— এবং তাঁরা সংসারে যাকে অভ্যস্ত আরাম বলে লোকে অবলম্বন করে নিশ্চিন্ত থাকে তাকে কারাগার বলেই নির্দেশ করেন। আজ যাঁর কথা বলছি তাঁর জীবনে সেই ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর পরিবারে ধনমানের অভাব ছিল না, চিরাগত প্রথা সেখানে আচরিত হত। কিন্তু, এক মুহূর্তেই মৃত্যুর আঘাতে তিনি যেমনি জাগলেন অমনি বুঝলেন যে এর মধ্যে শান্তি নেই। তিনি বললেন, 'আমার পিতাকে আমি জানতে চাই। দশজনের মতো করে তাঁকে জানতে চাই না, তাঁকে জানতে পারি না।' সত্যকে তিনি জীবনে প্রত্যক্ষভাবে জানতে চেয়েছিলেন; দশজনের মুখের কথায়, শাস্ত্রবাক্যে আচারে বিচারে তাঁকে জানবার চেষ্টাকে তিনি পরিহার করেছিলেন। সেই যে তাঁর উদ্‌বোধন সে প্রত্যক্ষ সত্যের মধ্যে উদ্‌বোধন, সেই প্রথমযৌবনের প্রারম্ভে যে তাঁর

দীক্ষাগ্রহণ সে মুক্তির দীক্ষা-গ্রহণ। যেদিন পক্ষীশাবকের পাখা ওঠে সেইদিনই পক্ষীমাতা তাকে উড়তে শেখায়। তেমনি তারই দীক্ষার দরকার যার মুক্তির দরকার। চারি দিকের জড় সংস্কারের আবরণ থেকে তিনি মুক্তি চেয়েছিলেন।

তাঁর কাছে সেই মুক্তির দীক্ষা নেব বলেই আমরা আশ্রমে এসেছি। ঈশ্বরের সঙ্গে যে আমাদের স্বাধীন মুক্ত যোগ সেইটে আমরা এখানে উপলব্ধি করব; যে-সব কাল্পনিক কৃত্রিম ব্যবধান তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ হতে দিচ্ছে না তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করব। যেটা কারাগার তার পিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকাটি যদি সোনার শলাকা হয় তবু সে কারাগার, তার মধ্যে মুক্তি নেই। এখানে আমাদের সকল কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে। এখানে মুক্তির সেই দীক্ষা নেবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। সেই দীক্ষাটিই যে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

তাই আমি বলছি যে, এ আশ্রম— এখানে কোনো দল নেই, সম্প্রদায় নেই। মানস-সরোবরে যেমন পদ্ম বিকশিত হয় তেমনি এই প্রান্তরের আকাশে এই আশ্রমটি জেগে উঠেছে, একে কোনো সম্প্রদায়ের বলতে পারবে না। সত্যকে লাভ করবার দ্বারা আমরা তো কোনো নামকে পাই না। কতবার কত মহাপুরুষ এসেছেন— তাঁরা মানুষকে এই-সব কৃত্রিম সংস্কারের বন্ধন থেকেই মুক্তি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা সে কথা ভুলে গিয়ে সেই বন্ধনেই জড়াই, সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করি। যে সত্যের আঘাতে কারাগারের প্রাচীর ভাঙি তাই দিয়ে তাকে নতুন নাম দিয়ে পুনরায় প্রাচীর গড়ি এবং সেই নামের পুজো শুরু করে দিই। বলি, আমার বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত সমাজভুক্ত যে-সকল মানুষ তারাই আমার ধর্মবন্ধু, তারাই আমার আপন। না, এখানে এ আশ্রমে আমাদের

এ কথা বলবার কথা নয়। এখানে এই পাখিরাই আমাদের ধর্মবন্ধু, যে সাঁওতাল বালকেরা আমাদের শুভবুদ্ধিকে নিয়ত জাগ্রত করছে তারাই আমাদের ধর্মবন্ধু। আমাদের এই আশ্রম থেকে কেউ নাম নিয়ে যাবে না। স্বাস্থ্যলাভ করলে, বিদ্যালাভ করলে, মানুষের নাম যেমন বদলায় না, তেমনি ধর্মকে লাভ করলে নাম বদলাবার দরকার নেই। এখানে আমরা যে ধর্মের দীক্ষা পাব সে দীক্ষা মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বের দীক্ষা।

বাইরের ক্ষেত্রে মহর্ষি আমাদের সবাইকে কোন্ বড়ো জিনিস দিয়ে গিয়েছেন? কোনো সম্প্রদায় নয়, এই আশ্রম। এখানে আমরা নামের পুজো থেকে, দলের পুজো থেকে, আপনাদের রক্ষা করে সকলেই আশ্রয় পাব—এইজন্যেই তো আশ্রম। যে-কোনো দেশ থেকে, যে-কোনো সমাজ থেকে, যেই আসুক-না কেন, তাঁর পুণ্য-জীবনের জ্যোতিতে পরিবৃত হয়ে আমরা সকলকেই এই মুক্তির ক্ষেত্রে আহ্বান করব। দেশ-দেশান্তর দূর-দূরান্তর থেকে যে-কোনো ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমরা যেন কাউকে গ্রহণ করতে কোনো সংস্কারের বাধা বোধ না করি। কোনো সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সংকুচিত না হয়।

যে মুক্তির বাণী তিনি তাঁর জীবন দিয়ে প্রচার করে গিয়েছিলেন তাকেই আমরা গ্রহণ করব—সেই তাঁর দীক্ষামন্ত্রটি: ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্। ঈশ্বরের মধ্যে সমস্তকে দেখো। সেই মন্ত্রে তাঁর মন উতলা হয়েছিল। সর্বত্র সকল অবস্থায় আমরা যেন দেখতে পাই তিনি সত্য, জগতের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে তিনি সত্যকেই প্রকাশ করছেন। কোনো সম্প্রদায় বলতে পারবে না যে, সে সত্যকে শেষ করে পেয়েছে। কালে কালে সত্যের নব নব প্রকাশ। এখানে দিনে দিনে আমাদের

জীবন সেই সত্যের মধ্যে নূতন নূতন বিকাশ লাভ করবে, এই আমাদের আশা। আমরা এই মুক্তির সরোবরে স্নান করে আনন্দিত হই, সমস্ত সম্প্রদায়ের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে আনন্দিত হই।

১৩২০

৫

আশ্রমকে যেদিন সত্য করে দেখতে হবে সেদিন আনন্দের সংগীত বেজে উঠবে, ফুলের মালা দুলবে, সূর্যের কিরণ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে— কারণ, আনন্দের মধ্য দিয়েই সত্যকে দেখা সম্ভব হয়, আর-কোনো উপায়ে নয়। আমাদের একান্ত আসক্তি দিয়ে সব জিনিসকে বাইরের দিক থেকে আঁকড়ে থাকি— সেইজন্যই সেই আসক্তি থেকে ছাড়িয়ে ভিতরকার আনন্দরূপকে দেখবার এক-এক দিন আসে।

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কোন্ দিনটিকে আশ্রমের এই সত্য রূপকে দেখবার উৎসবের দিন করেছেন? সে তাঁর দীক্ষার দিন। দীক্ষা সেইদিন যেদিন মানুষ আপনার মধ্যে যেটি বড়ো, আপনার মধ্যে যে অমর জীবন, তাকে স্বীকার করে। সংসারের ক্ষেত্রে মানুষ যে জন্মায় তাতে তার কোনো চেষ্টা নেই; সেখানকার আয়োজন তার আসবার অনেক পূর্ব থেকে প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু, মানুষ আপনাকে আপনি অতিক্রম করে যেদিন একেবারে সূর্যের আলোর কাছে, নিখিল আকাশের কাছে, পুণ্য সমীরণের কাছে, বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দক্ষিণ হস্তের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে— যেদিন এই কথা বলে যে 'আমি অনন্ত কালের অমৃত-জীবনের মানুষ, আমারই মধ্যে সেই বৃহৎ সেই বিরাট সেই ভূমার প্রকাশ' —সেদিন সমস্ত মানুষের উৎসবের দিন। সেইরকম একটি দীক্ষার দিন, যেদিন মহর্ষি বিশ্বের মধ্যে অনন্তকে প্রণাম করেছেন, যেদিন আপনার মধ্যে অমৃতজীবনকে অনুভব করে তাকে অর্ঘ্যরূপে তাঁর কাছে নিবেদন করে দিয়েছেন, সেই দিনটি যে বাস্তবিকই উৎসবের দিন এই কথা অনুভব করে তিনি তাকে আমাদের জন্যে দান করে গিয়েছেন। মহর্ষির সেই দীক্ষাকে আশ্রয় করেই এখানে আমরা আছি। এই আশ্রম

তাঁর সেই দীক্ষাদিনটিরই বাইরের রূপ। কারণ, এখানে কর্মে দীক্ষা, শিক্ষায় দীক্ষা, শিক্ষকতায় দীক্ষা— সেই অমরজীবনের দীক্ষা। সেই পরম দীক্ষার মন্ত্রটি এই আশ্রমের মধ্যে রয়ে গেছে। প্রতিদিন সে কথা যদি ভুলে গিয়ে থাকি, অন্তত আজ উৎসবের আনন্দালোকে আশ্রমের সেই অমৃতরূপকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করবার জন্য প্রস্তুত হও। আজ উদ্‌বোধিত হও, সত্যকে দেখো। আজ বাতাসের মধ্যে সেই দীক্ষার মন্ত্র শ্রবণ করো—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

'যে পরম ইচ্ছায় সমস্ত জগৎ বিধৃত ও চালিত, যে পরম ইচ্ছায় সূর্য চন্দ্র তারা নিয়মিত, এবং আকাশের অনন্ত-আরতি-দীপের কোনোদিন নির্বাণ নাই, সেই পরম ইচ্ছার দ্বারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে আচ্ছন্ন ইহা উপলব্ধি করো!' সব স্পন্দিত তাঁর ইচ্ছার কম্পনে, তাঁর আনন্দের বিদ্যুতে। সেই আনন্দকে দেখো। তিনি ত্যাগ করছেন তাই ভোগ করছি। তিনি ত্যাগ করছেন তাই জীবনের উৎস দশ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, আনন্দের নদী শাখায় প্রশাখায় বয়ে যাচ্ছে, ঘরে ঘরে স্বামীস্ত্রীর পবিত্র প্রীতিতে— পিতামাতার গভীর স্নেহে— মাধুর্যধারার অবসান নেই। অজস্র ধারায় সেই জীবন, সেই আনন্দ, সেই প্রেম প্রবাহিত; ভোগ করো, আনন্দে ভোগ করো। আকাশের নীলিমায়, কাননের শ্যামলিমায়, জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে— ভোগ করো, পরিপূর্ণরূপে ভোগ করো! মা গৃধঃ। মনের ভিতরে কোনো কলুষ, কোনো লোভ না আসুক। পাপের লোভের সকল বন্ধন মুক্ত হোক। এই তাঁর দীক্ষার মন্ত্র।

এই মন্ত্র আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে, এই মন্ত্র এই আশ্রমকে রক্ষা করেছে। এই আশ্রমের আকাশে, পুণ্য সমীরণে, নির্মল আলোকে, উদার প্রান্তরে,

এই আমাদের সম্মিলিত জীবনের মধ্যে এই মন্ত্রকে দেখবার, শ্রবণ করবার, গ্রহণ করবার জন্য অদ্য এই উৎসব। চিত্ত জাগ্রত হোক, আশ্রমদেবতা প্রত্যক্ষ হোন, তিনি তাঁর মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করুন। এই ফুলের মতো সুকুমার তরুণজীবনগুলির উপর তাঁর স্নেহাশীর্বাদ পড়ুক, বিকশিত হোক এরা পুণ্যে প্রেমে পবিত্রতায়; স্মরণ করুক এই শুভদিন, গ্রহণ করুক এই মন্ত্র— এই চিরজীবনের পাথেয়। এদের সম্মুখে সমস্ত জীবনের পথ রয়েছে— অমৃত আশীর্বাদ এরা গ্রহণ করে যাত্রা করুক, চিরজীবনের দীক্ষাকে লাভ করে এরা অগ্রসর হয়ে যাক। পথের সমস্ত বাধা-বিপত্তি-সংকটকে অতিক্রম করে যাবার জন্যে এই দীক্ষার মন্ত্র তাদের সহায় হোক: উদ্‌বোধিত হও, জীবনকে উদ্‌বোধিত করো।

১৩২১

যে মহাত্মা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজ তাঁর দীক্ষাদিনের সাম্বৎসরিক উৎসব। তাই আজ তাঁর সেই দীক্ষাদিনের ইতিহাসকে স্মরণ করব।

তার কিছু পূর্বেই তাঁর জীবনে মৃত্যুর আগুন জ্বলেছিল। তারই আলোতে তিনি আপনাকে আর জগৎটাকে একবার দেখলেন। এ একেবারে নতুন দেখা। এতই নতুন যে সম্পূর্ণ বুঝতে পারা যায় না, কেবল বেদনাবোধ হয়। কিসের বেদনা? বেদনা এইজন্যে যে, সেই পুরাতন পরিচয় এই নতুন জীবনের পথ দেখাতে পারে না, এর মানে বুঝিয়ে দিতে পারে না।

কিন্তু তিনি এই যে বৈরাগ্যের আঘাতে জেগে উঠলেন সে কি শূন্যতার মধ্যেই জাগলেন? তাঁর পূর্বজীবনের পর্দা যখন ছিন্ন হয়ে গেল তখন সামনে তাঁর কি মৃত্যুরই গহ্বর প্রকাশ পেলে? তা নয়, পূর্বে তিনি ছিলেন বেড়ার মাঝখানে, এখন সেই বেড়া ভেঙে যেতেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন পথের মধ্যে।

মানুষ যতদিন বেড়ার মধ্যে থাকে ততদিন তার যে কোনো গম্যস্থান আছে, এ কথা কেউ তাকে বলে না। সব দেয়ালগুলোই বলে, এইখানেই স্থিতি নয়; চলতে হবে, জানতে হবে, পেতে হবে।

একেবারেই উল্‌টো কথা। বেড়ার কথা থেকে রাস্তার কথা। সংসারের মানেটাই বদলে গেল। আগেকার জীবনের সঙ্গে আগেকার অভ্যাসের মিল ছিল, এখনকার জীবনে তার কোনো মূল্যই রইল না, শুধু তাই নয়, তা বাধা হয়ে উঠল। সেইজন্যেই আরম্ভে এমন বিষম ব্যাকুলতা—কেননা আহ্বান সামনের দিকে কিন্তু বন্ধন পিছনের দিকে।

বন্ধন যতক্ষণ স্থিতির পক্ষে সহায়তা করেছিল ততক্ষণ তা আশ্রয়। কিন্তু পথের ডাক শুনেই বোঝা গেল সেটা মিথ্যা, সেটা একটা আপদ।

সাংসারিক আমি, ছোটো আমি, আপনার আরাম নিয়ে ধনজনমান নিয়ে, অহংকার নিয়ে বেশ গুছিয়ে বসেছিল—তার আয়োজনের তার উপকরণের অন্ত ছিল না। মৃত্যুর আঘাতমাত্রেই সে সমস্ত একেবারে শূন্য হয়ে গেল।

এই কুয়াশা যখন কেটে গেল তখন সূর্যকে কি পাওয়া যাবে না? সংসারের ছোটো আমিটা মৃত্যুর কাছে যখন আর আত্মসমর্থন করতে পারলে না তখন কি শূন্যতারই চরম জয় হয়? চিরজীবনের বড়ো আমি যে আত্মা সে কি মৃত্যুর সমস্ত রিক্ততা পরিপূর্ণ করে দিয়ে দেখা দিল না?

মহর্ষি সেই পরিপূর্ণতার আভাস পেলেন বলেই বেড়ার জীবনটা ফেলে দিয়ে পথের জীবন শুরু করে দিলেন। তিনি ভোগের আয়োজন ফেলে দিয়ে সন্ধানের আয়োজনে প্রবৃত্ত হলেন। ক্ষোভের মাথায় মানুষ যাই বলুক, শূন্যতাকে কখনোই সে বিশ্বাস করতে পারে না—সেইজন্যেই যখন হরণের দুর্যোগ আসে তখনি মানুষের পূরণের দিন আসন্ন হয়।

এতদিন তার ধন ঐশ্বর্য অত্যন্ত বাস্তবরূপে তাঁর সমস্ত জীবন পূর্ণ করে ছিল; যেই সে-সমস্ত মৃত্যুর স্পর্শে ছায়া হয়ে গেল অমনি তিনি বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, 'এই যে আমি!' এমন কিছুকে সেদিন তিনি স্পষ্ট করে অনুভব করলেন মৃত্যু যাকে সরিয়ে দিতে পারে নি।

কিন্তু সেই আমি সত্য হয়েছে কার মধ্যে? তার জগৎ কোথায় এইটি জানতে না পারলে এই জাগ্রত আমির দুঃখ কিছুতেই আর মিটতে পারে না। এতদিন উপকরণ দিয়ে যাকে ভোলানো গিয়েছিল এ তো সে নয়।
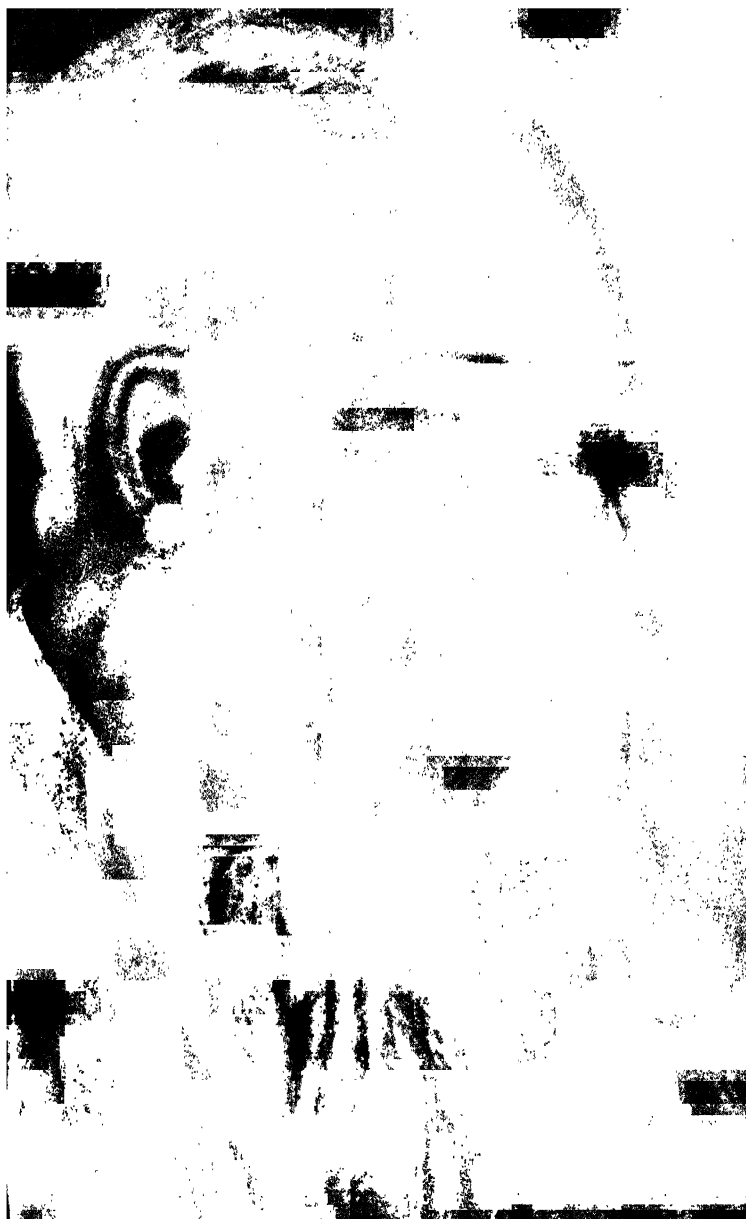
ধন দিয়ে মান দিয়ে এর প্রশ্নের উত্তর দেবে কি করে ? এ যে দারিদ্র্যকে স্বীকার করতে উদ্যত, এ যে অপমানকে বহন করতে উৎসুক।

এই যে আমি সমস্ত সুখদুঃখ লাভক্ষতি জন্মমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে চলেইছে, এর গতি কোথায়, এর আশ্রয় কোথায়, এর আনন্দ কোথায় এই সন্ধানে তিনি বেরলেন। সেই সন্ধান মিলল একটি বাণীর মধ্যে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

পূর্বেকার জীবনে তাঁর জগৎকে আচ্ছন্ন দেখেছিলেন তাঁর ক্ষুদ্র আপনাকে দিয়ে। তখন তাঁর আকাঙ্ক্ষা বাইরের ধনের দিকে ছিল, সে আকাঙ্ক্ষার বিরাম ছিল না। এই মন্ত্রে তাঁকে বলে দিলে জগতে যা-কিছু চলছে তাকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখো, এবং জানো যে তিনি তোমার জীবনের সমস্ত-কিছুর মধ্যেই আপনাকেই দান করছেন, তাঁর সেই দানই অন্তরে গ্রহণ করো, বাইরের ধনের প্রতি লোভ কোরো না।

এই মন্ত্রে তিনি জানতে পারলেন, তাঁর আশ্রয়ের ভিত বদলাতে হবে, শুধু এর মেরামত নয়; নিজেকে যে সিংহাসনে বসিয়েছেন সেই সিংহাসনে তাঁকে বসাতে হবে। আপনাকে দিয়েই সংসারের সকল জিনিসের মূল্য যাচাই না করে পরম সত্যকে দিয়ে করতে হবে এবং বাইরের ধনলাভকে দিয়ে ভোগকে না মেপে অন্তরের প্রেমকে দিয়ে তাকে মাপতে হবে।

মৃত্যু আসে, ক্ষণকালের জন্য আমাদের বৈরাগ্য আনে; কিন্তু আমাদের অভ্যাসের প্রাচীর এমন মজবুত যে সামান্য একটু ছিদ্র খনন করে সে ছিদ্র দেখতে দেখতে আবার বুজে যায়। তাই আমরা সহজে এমন দীক্ষা গ্রহণ করি নে যে দীক্ষা আপনার জায়গায় সত্যকে, ধনের জায়গায় প্রেমকে স্বীকার করায়। বৈরাগ্যের পরম মুক্তি অন্ধকারে বিদ্যুতের মতো আসে, সূর্যের মতো উদিত হয় না।

শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, জাতির জীবনেও মৃত্যুর আঘাত এসে পৌঁছয়, দীর্ঘকাল যে ব্যবস্থা চলছিল সে ব্যবস্থা টেঁকে না, যে অর্থ জমছিল সে সঞ্চয় নিঃশেষিত হয়ে যায়, উন্নতির যে পথ শ্রদ্ধা লাভ করেছিল সে পথের উপর অবিশ্বাস জন্মে। তখন সমস্ত জাতির মধ্যে একটা বৈরাগ্যের দিন আসে। এই বৈরাগ্যের আলোকে নিরাসক্তভাবে সত্যকে দেখবার ইচ্ছা যদি-বা মনে আসে তবু তার বাধা সহজে দূর হতে চায় না। তাই নূতন জীবনের দীক্ষা সহজ হয়ে ওঠে না— 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং' এ বাণী দ্বারের কাছ পর্যন্ত এসে পৌঁছয়, কিন্তু অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ পায় না।

আজকের দিনে য়ুরোপ ধন মান প্রতাপ ও বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। সেই য়ুরোপের আসন আজ মৃত্যুর আঘাতে যেমন করে টলে উঠেছে ইতিহাসে এমন প্রায় দেখা যায় না। বাহিরের সেই টলার সঙ্গে তার অন্তর যে টলে ওঠে নি তা নয়— জীবনসমস্যা আর একবার চিন্তা করে দেখতে সে প্রবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু নূতন জীবনের দীক্ষা নেওয়া ছাড়া তার কি আর কোনো পথ আছে?

য়ুরোপে একদিন ফ্যুডাল-তন্ত্র প্রবর্তিত হয়। সেই তন্ত্রে সেখানকার নিম্নস্তরের জনসাধারণ উচ্চস্তরের শাসনকর্তাদের স্বার্থভার বহন করে এসেছে— একদলের দাসত্বের উপর আর-এক দলের প্রভুত্ব নির্ভর করেছে। তার পরে আজ সেখানে ডিমক্রেসির প্রাদুর্ভাব। এই ডিমক্রেসির প্রভাবে সেখানকার সমাজে অন্য ভেদরেখা ক্ষীণ হয়ে এসে ধনী-নির্ধনের ভেদরেখা বিপুল হয়ে উঠেছে। এখন সেখানে অনেকদিন থেকেই ধনিকের স্বার্থ কর্মিকেরা বহন করে এসেছে। এই ধনিকের স্বার্থজাল আজ সমস্ত জগৎকে বেষ্টন করেছে।

এই স্বার্থ যতই বিপুল হয়ে উঠেছে এই স্বার্থের সংঘাতও ততই

ভয়ংকর হয়েছে। সেই সংঘাতের ভীষণ রূপ আমরা দেখছি। এই ভীষণতা বিজ্ঞানের সহায়তায় ভাবী কালে আরো যে বিরাট মূর্তি ধরবে তার আর সন্দেহ নেই।

য়ুরোপে আজ তাই সমাজকে গড়ে তোলবার কাজে আর একবার হাত লাগাবার কথা হচ্ছে। কিন্তু 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং' এ কথা এখনো স্পষ্ট করে মনে উঠছে না। পূর্বে যে স্বার্থের একমহল দুর্গ ছিল তার জন্যে আজ সাতমহল দুর্গ বানিয়ে তাকে নিরাপদ করবার ইচ্ছা য়ুরোপে জেগে উঠেছে। এ কথা বুঝেও বুঝছে না যে, স্বার্থ কখনো বিরোধ মেটাতে পারে না। তাই এক দিকে শান্তির কথা চলছে আর-এক দিকে প্রকাশ্যে ও গোপনে অস্ত্রও শাণিত হচ্ছে। সেখানকার সমাজে বণিকের বেশে যে স্বার্থ গদিতে বসে আছে, রাজার বেশে সে স্বার্থ সিংহাসনে— তারা নিজের বাহ্যবেশ অল্পস্বল্প বদলাতে রাজি আছে কিন্তু কী উপায়ে তাদের গদি তাদের সিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী হয় এ চিন্তা কিছুতে তাদের মন থেকে ঘুচতে চায় না।

কিন্তু হয় নবজীবনের দীক্ষা নিতে হবে, নয় বারে বারে মৃত্যুর পরে মৃত্যু এসে সমস্ত লোপ করে দেবে, এর মাঝখানে কোনো রফা-নিষ্পত্তির কথা চলবে না। নিজেকেই ঈশ্বর করে এই চলমান জগতের সমস্ত চলাকে নিজের প্রয়োজনের দ্বারা চিরকাল অবরুদ্ধ করে রাখতে পারে সৌভাগ্য-ক্রমে এমন ক্ষমতা বিশ্বে কারো নেই। বাঁধ ভাঙবেই; সে বাঁধ আরো বড়ো করে বাঁধতে গেলে আরো বড়ো রকমের প্রলয়ের মধ্যেই ভাঙবে। তাই বলছি সত্যকে অন্তরের মধ্যে না পেয়ে মিথ্যাকে বিধিবিধানের জোরে বাইরের দিকে ঠেকাবার চেষ্টা বড়ো অপঘাতের দ্বারা মরবারই চেষ্টা— সেই অপঘাত হঠাৎ আসবে, তাকে কেউ সামলাতে পারবে না। য়ুরোপে আজ ভাবুকদলের কেউ কেউ বলছেন— এত দুঃখ ব্যর্থ হল, স্বার্থ

প্রবলতর হয়ে উঠল, মন কঠিনতর হয়ে উঠেছে, পাপ সমূলে উৎপাটিত হল না ; আবার মার খেতে হবে, আবার মরতে হবে, সেই আরো দুঃখের দিন আসছে, দীক্ষার দিন এখনো এল না।

নবজীবনের দীক্ষা যে-কেউ গ্রহণ করে, সমস্ত মানুষের হয়েই সে গ্রহণ করে, এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। সত্য যেখানেই প্রকাশ পায় সেখানেই সমস্ত মানুষের জন্যই সে সঞ্চিত হয়, সমস্ত মানুষেরই প্রাণ-শক্তির সঙ্গে তার নিগূঢ় যোগ হয়। সমস্ত মানুষের হয়ে সত্য দীক্ষা গ্রহণ করবার অধিকার আমাদেরও আছে। দুঃখপীড়িত জগতের মাঝখানে বসে আজ আমাদের পক্ষে এই কথা গভীরভাবে ভাববার দিন। মানুষকে তার অহমিকা থেকে নড়িয়ে দিয়ে তাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার যে দীক্ষামন্ত্র, সেই মন্ত্র আমাদের প্রত্যেকের হোক।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

এই বাইরের জগতে যা-কিছু চলছে সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করে জানবে এবং অন্তরের জগতে যা-কিছু ভোগ করি সে সমস্তকে তাঁরই দান বলে গ্রহণ করবে, বাইরের ধনে লোভ করবে না।

১৩২৬

৭

যে মহাত্মা এই আশ্রমকে প্রতিষ্ঠিত করেন আজ তাঁর দীক্ষার সাম্বৎসরিক উৎসব। আমরা সকলে জানি যে যৌবনারম্ভে হঠাৎ একদিন সেই দীক্ষার মন্ত্র ছিন্নপত্র সহযোগে বাতাসে তাঁর হাতে এসে পড়ে। সেই মন্ত্র তিনি সকল জীবন ধরে সাধনা করেন। আমাদেরও সকলের জীবন সেই দীক্ষার অপেক্ষা করছে। আমাদের জন্যও তেমনি করেই দীক্ষামন্ত্র বাতাসে ফিরছে। প্রতিদিন প্রভাতের আলোকে সেই মন্ত্র বিকীর্ণ হচ্ছে ; কেবল সেটা আমাদের হাতে এসে পড়বার অপেক্ষা আছে। হাতে যে অকস্মাৎ এসে পড়ে তাও ঠিক নয়— ভিতরে আমাদের চিত্ত যখন অনুকূল হয় তখন বাইরে থেকে দীক্ষা কেমন করে আপনি এসে পৌঁছায়।

অথচ অন্তরের গভীরতার মধ্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আছে— সেই আকাঙ্ক্ষা বারে বারে তাকে তার আবরণ ছিন্ন করতে বলছে, নিজেকে নূতনতর করে প্রকাশ করতে বলছে ; কালের যে-সব আবর্জনা মানুষের চারি দিকে জমে উঠে তার পথকে বাধাগ্রস্ত করে, যে বাধাগুলি অভ্যাস-ক্রমে সে আপন আশ্রয় বলে কল্পনা করে এসেছে, তাকে ধূলিসাৎ করে নিজেকে আবার সম্মুখে অগ্রসর হতে বলছে। মানুষের ইতিহাস এই বারে বারে বাধা মোচনের ইতিহাস। বারে বারে তার মনের মধ্যে এই বাণী এসেছে 'ত্যাগ করতে হবে', এই বাণী এসেছে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' —ওঠো, জাগো, আরামের শয্যা ত্যাগ করো, সঞ্চয়ের স্তূপ ধ্বংস করো ; সেই পথে চলো কবিরা যাকে বলেন, 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ।' অভ্যাসের জড়তায় অন্তরের এই গভীরতম বাণীকে মানুষ অনেক কাল অবজ্ঞা করে চলার পথের বাধাকেই ক্রমশ বিপুল করে তোলে। তখনই প্রচণ্ড বিপ্লব ঝড়ের মতো এসে পড়ে। যুদ্ধবিগ্রহ হঠাৎ

কোথা থেকে অবতীর্ণ হয়ে ঐশ্বর্যপ্রাকারবেষ্টিত জাতির চিত্তকে আঘাত করে— যে পুরাতন প্রথার আবরণে তার সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে পরম বেদনায় তাকে ছিন্ন করে দেয়, ঘোষণা করে যে কোনো বেষ্টনের মধ্যে তার চিরস্থিতি হতে পারে না। সেইজন্য অপ্রত্যাশিত অপঘাতে দেশ সহসা তার দীক্ষার মন্ত্র লাভ করে।

নবজীবনের দীক্ষার মন্ত্র তেমনি করেই শোকের অভিঘাতে অভ্যাসের বাধা বিদীর্ণ করে মহর্ষির চিত্তের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল। সেই দীক্ষার অমৃতবাণী ভারতের প্রাচীন তপোবনে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। আজ আমাদের কে তাকে গ্রহণ করবে, কখন গ্রহণ করবে, বর্তমান যুগে সেই অপেক্ষা রয়েছে। সেই বাণী নবজীবনের মন্ত্র বহন করছে, কে তাকে নিতে প্রস্তুত আছে? আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি, আধুনিক কালে একজন মহাত্মার চিত্তক্ষেত্রে সেই মন্ত্র বীজরূপে এসে পড়েছিল।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

আমরা চোখে যা দেখছি তা কী? এই যে নানা গতিবেগ পরিবর্তনের মধ্যে যা চলছে ঘটছে, এটাই তো প্রত্যক্ষ। কিন্তু বাহিরের এই গতিকেই মানুষ চরম বলে স্বীকার করে নি। যাঁর দৃষ্টি সত্য হয়েছে তিনি এই চলনশীলতার ভিতর যখন পরিপূর্ণতার আদর্শ দেখেছেন তখন তাঁর চিন্তা, বাক্য, কর্ম সত্য হয়েছে। অন্ধ গতিকে চরম বলে মেনে নিলে জগতে বিরোধের অন্ত থাকে না। মানুষ তা হলে ঘোর অন্ধতার দ্বারা নীত হয়ে চলে, পরস্পরকে বেদনা দেয়।

কিন্তু শুধু ধ্যানের দৃষ্টিতে সত্যকে দেখা এবং সেই ধ্যানের আনন্দে মুগ্ধ থাকাই জীবনের পূর্ণতা সাধন নয়। দীক্ষার মন্ত্র শুধু ধ্যানের মন্ত্র নয়, তা

কর্মের মন্ত্র। সত্যের দীক্ষা নিখিলের সঙ্গে চিন্তা, ভাব ও কর্মের সত্য যোগসাধন করে— সেই যোগে কল্যাণ। সেইজন্য এই দীক্ষামন্ত্রের প্রথম অংশে আছে বটে যে বিশ্বজগতে যা-কিছু নিরন্তর চলছে তাকে ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করে উপলব্ধি করো কিন্তু কেবল আন্তরিক উপলব্ধির মধ্যেই মন্ত্রটি থামে নি, তার পরে বলা হয়েছে যে, যে ভোগের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে সেই আকাঙ্ক্ষাকে কোন্ সত্যের দ্বারা নিয়মিত করবে? 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা', ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে— 'মা গৃধঃ', লোভ কোরো না। লোভের দ্বারা মানুষ ভোগের যে আয়োজন করে তাতেই অনর্থপাত করে; সেই ভোগ নিজের আত্মাকে অবরুদ্ধ ও অন্যের আত্মাকে পীড়িত করতে থাকে— অবশেষে একদিন প্রলয়ের মধ্যে তার অবসান হয়। তার কারণ যে-লোভ স্বার্থের দিকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে তা সেই বাণীকে অস্বীকার করে যে বাণী জানায় যে, যা-কিছু আছে সমস্তকে এক অনন্ত পুরুষের দ্বারা অধিকৃত বলে জানবে। লোভ ক্রোধ মোহ আমাদের চিত্তের স্বাভিমুখী গতি, তা আমাদের স্বার্থের সীমার দিকে টানে, যিনি সকলকে সর্বত্র অধিকার করে আছেন তাঁর দিকের থেকে ফিরিয়ে আনে। এইজন্য পৃথিবীতে লোভকৃত কর্ম স্বার্থঘটিত চেষ্টা কোনো মহৎকে সৃষ্টি করে না—কেননা সৃষ্টি সেই সত্যের দ্বারাই হয় যা নিঃস্বার্থ আনন্দময়। পূর্ণতার যে প্রেরণা সেই হচ্ছে সৃষ্টির প্রেরণা, সেই হচ্ছে ত্যাগের প্রেরণা। সেই ত্যাগের দীক্ষাই আমাদের সত্য দীক্ষা, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ।'

মানুষের দৈহিক জীবনের ক্ষুধা তৃষ্ণা বেদনা তাকে ছোটো গণ্ডীতে বদ্ধ করে স্বার্থের দাবির দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছে, প্রবৃত্তির বেগ তাকে বিচলিত করছে। কিন্তু সে বলে যে এই দাবিকে যদিও অস্বীকার করা কঠিন তবুও একে চরম বলে গ্রহণ করা যায় না। আমাদের পেট

ভরানো ও সংগ্রহ করার সীমাকে নিরন্তর অতিক্রম করতে থাকলে অবশেষে ক্লান্তি ও অবসাদ আসে, আত্মা মাথা নেড়ে বলে, না, এতে হল না, আমার এতে পরিতৃপ্তি নাই। এমনি করেই একদিন এক মহাপুরুষের কাছে আকাশের আলোও কালো বলে বোধ হয়েছিল। গভীরতম আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ঐশ্বর্যের সুখ-স্বপ্নে তাড়না করল। কিসের জন্য অন্তরের বেদনা, কী চাই— তা তখনো মনে আসে নি। আত্মার ক্রন্দন তাঁকে আঘাত করে জাগাল, এমন সময়ে যে দীক্ষার মন্ত্র ভারতের বায়ুতে ভেসে বেড়াচ্ছিল তাই তাঁর কাছে সহসা এসে পৌঁছল।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

সেদিন থেকে তাঁর যা-কিছু ত্যাগ আর নিবেদন সব সেই পরমানন্দ স্বরূপের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে অহংকারের বন্ধন বারে বারে ক্ষণে ক্ষণে ছিন্ন করতে হয়েছে। সমগ্র জীবন ধরে তিনি অনন্ত জীবনের লক্ষ্যপথে আত্মাকে প্রবৃত্ত করেছেন।

এই তো মানুষের সাধনা। সে যখন ত্যাগের দ্বারা আপন সম্পদকে নিখিলের কাছে উৎসর্গ করে অমনি সে সত্য হয়ে উঠে। এত দুঃখ-বেদনার ভিতরও মানুষ তা অনুভব করছে। সে বুঝছে যে কেবলই অন্ধের মতো হাতড়াচ্ছে, বিষম ঘূর্ণিপাকে তার অশান্তির শেষ নাই। কিন্তু তার নিজের এবং তার চারি দিকের জড় অভ্যাসে ক্ষুদ্রের পথেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, ভূমার পথে না। সেই অভ্যাসের অচেতনতার থেকে তার জাগরণ আর ঘটবে না— সেইজন্য প্রতিদিন সূর্যোদয়ের মধ্যে যে উদ্‌বোধনের দীক্ষা আমাদের কাছে আসছে, যে দীক্ষা আমাদের প্রাচীন ভারতে সত্যদ্রষ্টার কণ্ঠে বাণী লাভ করেছে সে তো বারে বারেই ফিরে

যাচ্ছে। কিন্তু সেই দীক্ষা সাধকের সার্থক জীবনের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরের মধ্যে আজ প্রবেশ করুক। এখনই আমাদের শুভক্ষণ আসুক। এখনই আমাদের আত্মার গভীরতম প্রতীক্ষাকে সেই মন্ত্র অমৃতের দীক্ষায় চরিতার্থ করুক।

১৩২৮

৮

এই আশ্রমের যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ তাঁর দীক্ষার সাম্বৎসরিক দিন।

দীক্ষা বলতে কী বুঝি? মানুষ অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে পৃথিবীকে ভোগ করবে বলে জন্মেছে। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় মর্তপ্রাণের নানা আকাঙ্ক্ষা সে মেটাতে থাকে, দৈহিক মানসিক নানাবিধ খাদ্য সে সংগ্রহ করে। কিন্তু এতেও শেষ হল না, এই আকাঙ্ক্ষার উপরেও আর-এক মহৎ আকাঙ্ক্ষা তার আছে। এমন-কি, সে বলে, অন্য আকাঙ্ক্ষাটির দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি চাই। এই তার এক-আপন থেকে আর-এক আপনের মুক্তি। তার ছোটো থেকে তার বড়োর মুক্তি। এ মুক্তি তার আত্মঘাত নয়, তার আত্মপ্রকাশ— যেমন মুক্তি বীজের বদ্ধতা থেকে অঙ্কুরের উদ্‌ভিন্নতা— তাতে বীজের ধ্বংস নয় তাতেই বীজের উদ্ধার, কারণ এই অঙ্কুরেই তার সত্যের বিকাশ।

মানুষের এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সকল ক্ষেত্রেই কাজ করছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখি অন্যান্য জীবজন্তুর মতো জীবনযাত্রার উপযোগী অভিজ্ঞতাটুকু নিয়ে মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে পারলে না; জ্ঞানের যে ছোটো বেড়া তার থেকে আপন জিজ্ঞাসাকে সে মুক্তি দিতে চেয়েছে। সমুদ্রের তলদেশে উত্তর মেরুর তুষারক্ষেত্রে আফ্রিকার পথহীন অরণ্যে— গ্রহনক্ষত্রের সুদূর সীমান্তে অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ানের মধ্যে তার সন্ধান ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইন্দ্রিয়বোধের সহজ বেষ্টনীটুকুর মধ্যে জ্ঞানবুভুক্ষু চিত্তকে কেউ ধরে রাখতে পারলে না।

মানুষের মধ্যে যেমন এই জ্ঞানের মুক্তির প্রেরণা তেমনি প্রেরণা কর্মের মুক্তির। যে-কর্ম নিজের ছোটো স্বার্থের বেড়ার মধ্যেই বদ্ধ সেই

কর্মের মধ্যেই তো মানুষের পরিতৃপ্তি হল না। ভোগের কর্ম জীবন-মাত্রেরই, ত্যাগের কর্ম মানুষের। ভোগের যে অনুষ্ঠান যে আয়োজন তাতে ক্ষয় লেগে আছে। তাতে যা ব্যয় হয় তা নষ্ট হয়, এইজন্যেই ভোগের ক্ষেত্রে জন্তুতে জন্তুতে কাড়াকাড়ি মারামারির অন্ত নেই। এই কাড়াকাড়ি মারামারির চেষ্টাকেই মানুষ আপন জীবনের একমাত্র নিত্য চেষ্টা বলে স্থির করে বসে নেই। তার যে-কর্মে আত্মত্যাগের চেষ্টা প্রকাশ পায় সেই কর্মই তার মুক্ত কর্ম। সেখানে সে যে-ফললাভ করে সে-ফল তার অন্তরে; টাকাকড়ির মতো সে-ফল নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে না। মানবদের মধ্যে যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা নিজের সমস্ত জীবন দিয়ে এই কথাই প্রকাশ করেছেন যে, ভোগের জগতেই বন্ধন, ত্যাগের জগতেই মুক্তি।

প্রাকৃতিক শক্তির তাড়নায় আমরা জীবলোকের বাসনারাজ্যে ঘুরে বেড়াই কিন্তু অমৃতলোকের অধিকার পাবার জন্যে আমরা দীক্ষা গ্রহণ করি। প্রাকৃতিক শক্তি আমাদের যে-বাসনা উদ্রেক করে তাকে আমরা বলি প্রবৃত্তি, তার মধ্যে আত্মকর্তৃত্ব নেই। কিন্তু দীক্ষা হচ্ছে সেই ইচ্ছাকে স্বীকার করা যা আত্মার। তার মধ্যে তাড়না নেই, আছে সাধনা।

একদা প্রিয়জনের মৃত্যুঘটনায় মহর্ষির মনে দীক্ষার প্রথম উদ্‌বোধন জাগে। প্রেম মৃত্যুকে স্বীকার করতে চায় না, সে নিজের মধ্যেই অমৃত-লোকের সাক্ষ্য পায়। প্রেম কোনো না-পদার্থকে মানে না—তার নিজের অস্তিত্বই পূর্ণতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য প্রেম যখন মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়ায় তখন তার সম্মুখে মৃত্যুই অমৃতলোকের বার্তা বহন করে, সে বলে, 'না-পদার্থ কোথাও নেই, সমস্তই পরিপূর্ণতার মধ্যে।' এই কথাই ঋষির বাণী অবলম্বন করে দীক্ষামন্ত্ররূপে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' এই দীক্ষা-

বাণী নিয়ে বিশ্বজগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখতে পাওয়াই তো অমৃতলোককে উপলব্ধি করা। এই পূর্ণতার উপলব্ধি দ্বারাই মানুষ ত্যাগের সাধনা গ্রহণ করতে পারে। সেইজন্যে যে-মন্ত্রের প্রথম অংশে পরিপূর্ণতার কথা আছে সেই মন্ত্রেরই দ্বিতীয় অংশে আছে 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনং।' অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপকে যিনি জেনেছেন, তাঁর আনন্দ ভোগের দ্বারা নয়, ত্যাগের দ্বারা। পূর্ণই যে সত্য এ কথা ত্যাগের দ্বারাই আমরা বুঝি। এই বুঝেই আমাদের মুক্তি। ওই মন্ত্রে আছে 'মা গৃধঃ', লোভ কোরো না। কেননা, লোভ যে বন্ধন। সেই বন্ধন থেকেই যত যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তি। সকল পাপের মূলে এই লোভ। লোভ অসীমকে অস্বীকার করে, সংকীর্ণের মধ্যেই আত্মাকে বদ্ধ করতে চায়।

প্রবৃত্তির রাজ্যে আমরা যাকে সমৃদ্ধি বলি সে হচ্ছে সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের দ্বারা বস্তুকে বহুগুণিত করা উপকরণের প্রসার সাধন। দীক্ষায় আমাদের যে রাজ্যের পথনির্দেশ করে সেখানকার সমৃদ্ধি হচ্ছে ত্যাগের দ্বারা আত্মার প্রসার সাধন। সেখানে বাহিরে বস্তুর মধ্যে আপনাকে অবরুদ্ধ করা নয়, ভূমার মধ্যে আত্মাকে মুক্তিদান করা।

মহর্ষির এই মুক্তির দীক্ষা ভিতরে ভিতরে আমাদের আশ্রমে কাজ করেছে। সেই দীক্ষা আমাদের সাধনক্ষেত্রের সীমা ক্রমশই বাড়িয়ে আজ আমাদের মহামানবের দ্বারে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। অন্য জীবজন্তুর জন্মগত সম্বন্ধ তার মা-বাপের সঙ্গেই। কোনো কোনো জন্তুর সমাজবন্ধন আছে কিন্তু সে-সকল সমাজ সংকীর্ণ। মানুষের জন্মগত সম্বন্ধ সমস্ত মানবলোকের সঙ্গে— সেই মানবলোক দেশে কালে বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষ জন্মমাত্রই সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষের তপস্যার অধিকারী হয়। সকল মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের এই বিরাট সম্বন্ধ আছে বলেই মানুষ এত বড়ো। কারণ এই ঐক্য সম্বন্ধই মানুষের মধ্যে সকলের

চেয়ে সত্য। এই সম্বন্ধ যেখানেই পীড়িত, খণ্ডিত, সেইখানেই মনুষ্যত্বের খর্বতা। এইজন্যেই কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক দিকে নয় সাংসারিক দিকেও পরস্পরের যোগেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে। সেই সার্থকতা লাভ কেবলমাত্র সুবিধাকে লাভ নয় সত্যকে লাভ। সেই লাভেই আমাদের ধর্ম আমাদের শান্তি আমাদের আনন্দ। মানুষ যখন নিজের ব্যক্তিগত সত্তাকে বড়ো করে পরিবারের মধ্যে নিজেকে সত্য বলে উপলব্ধি করে তখন সে যে কেবল কতকগুলি পারিবারিক সুবিধা লাভ করে তা নয়, মানবসম্বন্ধের বিস্তারজনিত আনন্দ লাভ করে। এইজন্যই এই সম্বন্ধের কাছে সে আপনার ব্যক্তিগত সুবিধা ও স্বার্থকে বিসর্জন করতেও প্রস্তুত হয়। মানুষ যেখানে আপনার দেশের কোলের মধ্যে আপনাকে সত্য বলে উপলব্ধি করে সেখানেও এই কথা খাটে— এমন-কি, সেখানে আপন পারিবারিক সুবিধা ও স্বার্থকেও বিসর্জন করতে সে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বের সীমা কি এইখানেই? মানুষে মানুষে ভেদ যে-বুদ্ধিতে বড়ো নাম ধরে ধর্মের স্থান অধিকার করতে উদ্যত হয়েছে সেই বুদ্ধি মানুষের সত্যকে আচ্ছন্ন করছে। সত্যের এই অপলাপেই পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তি, এই ভেদবুদ্ধির উগ্রতাই মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে পরাস্ত করে। যুদ্ধের অবসানে আজ য়ুরোপে যে নিদারুণ হিংস্রতা নির্লজ্জ মিথ্যাচার, ক্রোধ ও লোভের যে বীভৎস মূর্তি দেখা দিয়েছে, যা বিনাশের পন্থায় তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার কারণ তো ওইখানে। রাষ্ট্রীয় ভেদবুদ্ধিকে য়ুরোপ দীর্ঘকাল ধরে পূজা করে এসেছে। অপদেবতার পূজা অতি ভয়ংকর— কারণ তাতে উপস্থিত কিছু ফল পাওয়া যায়, কিন্তু সেই ফল বিষফল, এবং তার বিষ একদিন হঠাৎ অনপেক্ষিত মুহূর্তে সাংঘাতিকরূপে নিজেকে জানান দেয়। য়ুরোপ আজ সে কথা জানতে পারছে— কিন্তু জেনেও নিজেকে সামলাতে পারছে না। আমাদের

আশ্রমের দীক্ষায় যে-প্রার্থনামন্ত্রকে আমাদের কাছে ধরেছে, সে হচ্ছে অসতো মা সদ্‌গময়— অসত্য-বুদ্ধি থেকে আমার চিত্তকে সত্যের মধ্যে মুক্তি দাও। যাঁরা এই মুক্তিকামী যাঁরা সকল মানুষকে এই মুক্তি দিতে চান তাঁরা সকল দেশ থেকে এইখানে আসুন। সর্বমানবের যে সাজি তাতেই দেশবিদেশের সাধনার ফুল ও ফল একত্র সাজিয়ে আমরা বিশ্বদেবতাকে উৎসর্গ করব। একদিন আমরা বলেছিলেম বিদেশী ফুলে আমাদের দেবতার পূজা হয় না— কিন্তু আমাদের এখানে আজ আমরা যেন বলতে পারি সকল দেশের ফুল ছাড়া দেবতার পূজা সম্পূর্ণ হতেই পারে না। মৃত্যোর্মামৃতং গময়— হে পরমাত্মন্, যে মোহ ছোটোর মধ্যে মৃত্যুলোকে আমাদের ধরে রাখে তার বন্ধন থেকে আমাদের চিত্তকে অমৃতলোকে মুক্তি দান করো।

১৩২৯

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে ~~[illegible]~~ তুমি ধরায় আস।

ওগো সাধক ওগো প্রেমিক ওগো
পাগল ~~[illegible]~~ তুমি ধরায় আস।

এই অকূল সংসারে —
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে
ঘোর বিপদ মাঝে
(তুমি) কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস॥

তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল করে
(ওগো) কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালবাস।

~~তোমার ভাবনা কিছুই নাই~~
~~কে যে তোমার সাথের সাথী ভাবনা...~~
~~তুমি, সবার ভুলে~~
~~তোমার অনন্ত জীবন সাগর আনন্দে আসন।~~

গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

৩

জীবনস্মৃতি

জীবনস্মৃতি গ্রন্থের তিনটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ পিতার সম্বন্ধে বাল্য-স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; তাহার অংশবিশেষ এই বিভাগে মুদ্রিত হইল।

১

আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার পিতা প্রায় দেশ-ভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে তিনি কখনো হঠাৎ বাড়ি আসিতেন।

পিতা যখন আসিতেন আমরা কেবল আশপাশ হইতে দূরে তাঁহার চাকরবাকরদের মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৌতূহল মিটাইতাম। তাঁহার কাছে পৌঁছানো ঘটিয়া উঠিত না।

বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনো-এক সময়ে ইংরেজ গবর্মেণ্টের চিরন্তন জুজু রাসিয়ান-কর্তৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তখন পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ের কোন্-একটা ছিদ্রপথ দিয়া যে রুসীয়েরা সহসা ধূমকেতুর মতো প্রকাশ পাইবে, তাহা তো বলা যায় না। এইজন্য মার মনে অত্যন্ত উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তালাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন, 'রাসিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একখানা চিঠি লেখো তো।' মাতার উদ্‌বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয়, কী করিতে হয় কিছুই জানি না। দফতরখানায় মহানন্দ মুন্‌শির শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু, ভাষাটাতে জমিদারি সেরেস্তার সরস্বতী যে জীর্ণ কাগজের শুষ্ক পদ্মদলে

বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল। এই চিঠির উত্তর পাইয়াছিলাম। তাহাতে পিতা লিখিয়াছিলেন, ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাসিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রবল আশ্বাসবাণীতেও মাতার রাসিয়ানভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না, কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর হইতে রোজই আমি তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য মহানন্দের দফতরে হাজির হইতে লাগিলাম। বালকের উপদ্রবে অস্থির হইয়া কয়েকদিন মহানন্দ খসড়া করিয়া দিল। কিন্তু মাসুলের সংগতি তো নাই। মনে ধারণা ছিল, মহানন্দের হাতে চিঠি সমর্পণ করিয়া দিলেই বাকি দায়িত্বের কথা আমাকে আর চিন্তা করিতেই হইবে না, চিঠি অনায়াসেই যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিবে। বলা বাহুল্য, মহানন্দের বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং এ-চিঠিগুলি হিমাচলের শিখর পর্যন্ত পৌঁছে নাই।

বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প কয়েক দিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গম্‌ গম্‌ করিতে থাকিত। দেখিতাম, গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোনো ত্রুটি হয়, এইজন্য মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকরা তাহার তকমাওয়ালা পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি, এজন্য পূর্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।

একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিনজনের উপনয়ন দিবার জন্য।

বেদান্তবাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। অনেকদিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারামবাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে-সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারম্বার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল।

২

পইতা উপলক্ষে মাথা মুড়াইয়া ভয়ানক ভাবনা হইল, ইস্কুল যাইব কী করিয়া। গোজাতির প্রতি ফিরিঙ্গির ছেলের আন্তরিক আকর্ষণ যেমনি থাক্ ব্রাহ্মণের প্রতি তো তাহাদের ভক্তি নাই! অতএব, নেড়া মাথার উপরে তাহারা আর-কোনো জিনিস বর্ষণ যদি নাও করে তবে হাস্যবর্ষণ তো করিবেই।

এমন দুশ্চিন্তার সময়ে একদিন তেতালার ঘরে ডাক পড়িল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে যাইতে চাই কি না। 'চাই' এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়!

বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার সময় পিতা তাঁহার চিররীতি-অনুসারে বাড়ির সকলকে দালানে লইয়া উপাসনা করিলেন; গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া পিতার সঙ্গে গাড়িতে চড়িলাম। আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোশাক তৈরি হইয়াছে। কী রঙের কিরূপ কাপড় হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। মাথার জন্য একটা জরির-কাজ-করা গোল মখমলের টুপি হইয়াছিল। সেটা আমার হাতে ছিল, কারণ নেড়া মাথার উপর টুপি পরিতে আমার মনে মনে আপত্তি

ছিল। গাড়িতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন, 'মাথায় পরো।' পিতার কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইবার জো নাই। লজ্জিত মস্তকের উপর টুপিটা পরিতেই হইল। রেলগাড়িতে একটু সুযোগ বুঝিলেই টুপিটা খুলিয়া রাখিতাম। কিন্তু, পিতার দৃষ্টি একবারও এড়াইত না। তখনই সেটাকে স্বস্থানে তুলিতে হইত।

ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোনো জিনিস ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার কাজেও যেমন-তেমন করিয়া কিছু হইবার জো ছিল না। তাঁহার প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি তাঁহার সমস্ত কর্তব্য অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ছিল। আমাদের জাতিগত স্বভাবটা যথেষ্ট ঢিলাঢালা। অল্পস্বল্প এদিক-ওদিক হওয়াকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করি না। সেইজন্য তাঁহার সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের সকলকেই অত্যন্ত ভীত ও সতর্ক থাকিতে হইত। উনিশ-বিশ হইলে হয়তো কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যবস্থার যে লেশমাত্র নড়চড় ঘটে সেইখানে তিনি আঘাত পাইতেন। তিনি যাহা সংকল্প করিতেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনি মনশ্চক্ষুতে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন। এইজন্য কোনো ক্রিয়াকর্মে কোন্ জিনিসটা ঠিক কোথায় থাকিবে, কে কোথায় বসিবে, কাহার প্রতি কোন্ কাজের কতটুকু ভার থাকিবে, সমস্তই তিনি আগাগোড়া মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লইতেন এবং কিছুতেই কোনো অংশে তাহার অন্যথা হইতে দিতেন না। তাহার পরে সে-কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলে নানা লোকের কাছে তাহার বিবরণ শুনিতেন। প্রত্যেকের বর্ণনা মিলাইয়া লইয়া এবং মনের মধ্যে জোড়া দিয়া ঘটনাটি তিনি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেন। এ-সম্বন্ধে আমাদের দেশের জাতিগত ধর্ম তাঁহার একেবারেই ছিল না। তাঁহার

সংকল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিল্য ঘটিবার উপায় থাকিত না। এইজন্য হিমালয়যাত্রায় তাঁহার কাছে যতদিন ছিলাম, এক দিকে আমার প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল, অন্য দিকে সমস্ত আচরণ অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। যেখানে তিনি ছুটি দিতেন সেখানে তিনি কোনো কারণে কোনো বাধাই দিতেন না, যেখানে তিনি নিয়ম বাঁধিতেন সেখানে তিনি লেশমাত্র ছিদ্র রাখিতেন না।

যাত্রার আরম্ভে প্রথমে কিছুদিন বোলপুরে থাকিবার কথা।

যদিচ আমি নিতান্ত ছোটো ছিলাম কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছবিহারে নিষেধ করিতেন না। বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া, প্রান্তরতল হইতে নিম্নে, লাল কাঁকর ও নানাপ্রকার পাথরে খচিত ছোটো ছোটো শৈলমালা গুহাগহ্বর নদী-উপনদী রচনা করিয়া, বালখিল্যদের দেশের ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখানে এই ঢিবিওয়ালা খাদগুলিকে খোয়াই বলে। এখান হইতে জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া একদিনও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, 'কী চমৎকার! এ-সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে!' আমি বলিতাম, 'এমন আরো কত আছে! কত হাজার হাজার! আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।' তিনি বলিতেন, 'সে হইলে তো বেশ হয়। ওই পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।'

একটা পুকুর খুঁড়িবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত কঠিন মাটি বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই অসমাপ্ত গর্তের মাটি তুলিয়া দক্ষিণ ধারে পাহাড়ের অনুকরণে একটি উচ্চ স্তূপ তৈরি হইয়াছিল। সেখানে প্রভাতে আমার পিতা চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন। তাঁহার সম্মুখে পূর্বদিকের

প্রান্তরসীমায় সূর্যোদয় হইত। এই পাহাড়টাই পাথর দিয়া খচিত করিবার জন্য তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন।

খোয়াইয়ের মধ্যে এক জায়গায় মাটি চুঁইয়া একটা গভীর গর্তের মধ্যে জল জমা হইত। এই জলসঞ্চয় আপন বেষ্টন ছাপাইয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া বালির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। অতি ছোটো ছোটো মাছ সেই জলকুণ্ডের মুখের কাছে স্রোতের উজানে সন্তরণের স্পর্ধা প্রকাশ করিত। আমি পিতাকে গিয়া বলিলাম, 'ভারি সুন্দর জলের ধারা দেখিয়া আসিয়াছি, সেখান হইতে আমাদের স্নানের ও পানের জল আনিলে বেশ হয়।' তিনি আমার উৎসাহে যোগ দিয়া বলিলেন, 'তাই তো, সে তো বেশ হইবে।' এবং আবিষ্কারকর্তাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য সেইখান হইতেই জল আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

পিতা বোধকরি আমার সাবধানতাবৃত্তির উন্নতিসাধনের জন্য আমার কাছে দুই-চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন, হিসাব রাখিতে হইবে, এবং আমার প্রতি তাঁহার দামি সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন। ইহাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল সে-চিন্তা তিনি করিলেন না, আমাকে দায়িত্বে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে, ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন। অবশেষে তাঁহার কাছে জমাখরচ মেলাইবার সময় কিছুতেই মিলিত না। একদিন তো তহবিল বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'তোমাকেই দেখিতেছি আমার ক্যাশিয়ার রাখিতে হইবে, তোমার হাতে আমার টাকা বাড়িয়া উঠে।' তাঁহার ঘড়িতে যত্ন করিয়া নিয়মিত দম দিতাম। যত্ন কিছু প্রবলবেগেই করিতাম; ঘড়িটা অনতিকালের মধ্যেই মেরামতের জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে হইল।

বড়ো বয়সে কাজের ভার পাইয়া যখন তাঁহার কাছে হিসাব দিতে হইত সেইদিনের কথা এইখানে আমার মনে পড়িতেছে। তখন তিনি পার্ক স্ট্রীটে থাকিতেন। প্রতি মাসের দোসরা ও তেসরা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত। তিনি তখন নিজে পড়িতে পারিতেন না। গত মাসের ও গত বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিয়া সমস্ত আয়ব্যয়ের বিবরণ তাঁহার সম্মুখে ধরিতে হইত। প্রথমত মোটা অঙ্কগুলা তিনি শুনিয়া লইতেন ও মনে মনে তাহার যোগবিয়োগ করিয়া লইতেন। মনের মধ্যে যদি কোনোদিন অসংগতি অনুভব করিতেন তবে ছোটো ছোটো অঙ্কগুলা শুনাইয়া যাইতে হইত। কোনো কোনো দিন এমন ঘটিয়াছে, হিসাবে যেখানে কোনো দুর্বলতা থাকিত সেখানে তাঁহার বিরক্তি বাঁচাই-বার জন্য চাপিয়া গিয়াছি, কিন্তু কখনো তাহা চাপা থাকে নাই। হিসাবের মোট চেহারা তিনি চিত্তপটে আঁকিয়া লইতেন। যেখানে ছিদ্র পড়িত সেখানেই তিনি ধরিতে পারিতেন। এই কারণে মাসের ওই দুটা দিন বিশেষ উদ্‌বেগের দিন ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, মনের মধ্যে সকল জিনিস সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লওয়া তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল— তা হিসাবের অঙ্কই হোক, বা প্রাকৃতিক দৃশ্যই হোক, বা অনুষ্ঠানের আয়োজনই হোক। শান্তিনিকেতনের নূতন মন্দির প্রভৃতি অনেক জিনিস তিনি চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু যে-কেহ শান্তিনিকেতন দেখিয়া তাঁহার কাছে গিয়াছে, প্রত্যেক লোকের কাছ হইতে বিবরণ শুনিয়া তিনি অপ্রত্যক্ষ জিনিস-গুলিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আঁকিয়া না লইয়া ছাড়েন নাই। তাঁহার স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তি অসাধারণ ছিল। সেইজন্য একবার মনের মধ্যে যাহা গ্রহণ করিতেন তাহা কিছুতেই তাঁহার মন হইতে ভ্রষ্ট হইত না।

ভগবদ্‌গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ-সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন।

বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার 'পরে এই-সকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে অমৃতসরে গিয়া পৌঁছিলাম।

পথের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যেটা এখনো আমার মনে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। কোনো-একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। টিকিটপরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কী একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর-একজন আসিল; উভয়ে আমাদের গাড়ির দরজার কাছে উসখুস করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয় বারে বোধ হয় স্বয়ং স্টেশনমাস্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফ্‌টিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের অধিক নহে?' পিতা কহিলেন, 'না।' তখন আমার বয়স এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বৃদ্ধি কিছু বেশি হইয়াছিল। স্টেশনমাস্টার কহিল, 'ইহার জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে।' আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাক্স হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে-টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্ল্যাটফর্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। স্টেশনমাস্টার অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া চলিয়া গেল; টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন, এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিল।

অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। অনেকদিন সকালবেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখ-মন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ-উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা এক সময়ে সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন; বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছরির খণ্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।

একবার পিতা গুরুদরবারের একজন গায়ককে বাসায় আনাইয়া তাহার কাছ হইতে ভজনাগান শুনিয়াছিলেন। বোধকরি তাহাকে যে-পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল তাহার চেয়ে কম দিলেও সে খুশি হইত। ইহার ফল হইল এই, আমাদের বাসায় গান শোনাইবার উমেদারের আমদানি এত বেশি হইতে লাগিল যে তাহাদের পথরোধের জন্য শক্ত বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইল। বাড়িতে সুবিধা না পাইয়া তাহারা সরকারি রাস্তায় আসিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিল। প্রতিদিন সকালবেলায় পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। সেই সময়ে ক্ষণে ক্ষণে হঠাৎ সম্মুখে তানপুরা ঘাড়ে গায়কের আবির্ভাব হইত। যে-পাখির কাছে শিকারি অপরিচিত নহে সে যেমন কাহারো ঘাড়ের উপর বন্দুকের চোঙ দেখিলেই চমকিয়া উঠে, রাস্তার সুদূর কোনো-একটা কোণে তানপুরা-যন্ত্রের ডগাটা দেখিলেই আমাদের সেই দশা হইত। কিন্তু, শিকার এমনি সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাদের তানপুরার আওয়াজ নিতান্ত ফাঁকা আওয়াজের কাজ করিত; তাহা আমাদের দূরে ভাগাইয়া দিত, পাড়িয়া ফেলিতে পারিত না।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক

পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে,
কে সহায় ভব-অন্ধকারে।

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন— সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি একদিন আমার রচিত দুইটি পারমার্থিক কবিতা শ্রীকণ্ঠবাবুর নিকট শুনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড়ো বয়সে আর-একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম। সেই কথাটা এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান— 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।'

পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হার্মোনিয়মে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।

পিতা আমাকে ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়া **Peter Parley's Tales** পর্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্ক্‌লিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, জীবনী অনেকটা গল্পের মতো লাগিবে এবং তাহা পড়িয়া আমার উপকার হইবে। কিন্তু পড়াইতে গিয়া তাঁহার ভুল ভাঙিল। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্ক্‌লিন নিতান্তই সুবুদ্ধি মানুষ ছিলেন। তাঁহার হিসাব-করা কেজো ধর্মনীতির সংকীর্ণতা আমার পিতাকে পীড়িত করিত। তিনি এক-এক জায়গা পড়াইতে পড়াইতে ফ্র্যাঙ্ক্‌লিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

ইহার পূর্বে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করা ছাড়া সংস্কৃত পড়ার আর-কোনো চর্চা হয় নাই। পিতা আমাকে একেবারেই ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করিতে দিলেন। বাংলা আমাদিগকে এমন করিয়া পড়িতে হইয়াছিল যে, তাহাতেই আমাদের সংস্কৃতশিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। একেবারে গোড়া হইতেই যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনাকার্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিতেন। আমি যাহা পড়িতাম তাহারই শব্দগুলা উলটপালট করিয়া লম্বা লম্বা সমাস গাঁথিয়া যেখানে-সেখানে যথেচ্ছ অনুস্বার যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করি তুলিতাম। কিন্তু, পিতা আমার এই অদ্ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই।

ইহা ছাড়া তিনি প্রক্টরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন ; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।

তাঁহার নিজের পড়ার জন্য তিনি যে-বইগুলি সঙ্গে লইয়াছিলেন

তাহার মধ্যে একটা আমার চোখে খুব ঠেকিত। দশ-বারো খণ্ডে বাঁধানো বৃহদাকার গিবনের 'রোম'। দেখিয়া মনে হইত না ইহার মধ্যে কিছু-মাত্র রস আছে। আমি মনে ভাবিতাম, আমাকে দায়ে পড়িয়া অনেক জিনিস পড়িতে হয়, কারণ আমি বালক, আমার উপায় নাই— কিন্তু ইনি তো ইচ্ছা করিলেই না পড়িলেই পারিতেন, তবে এ দুঃখ কেন।

অমৃতসরে মাসখানেক ছিলাম। সেখান হইতে চৈত্র মাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অমৃতসরে মাস আর কাটিতেছিল না। হিমালয়ের আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিলাম তখন পর্বতের উপত্যকা-অধিত্যকাদেশে নানাবিধ চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে সৌন্দর্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা প্রাতঃকালেই দুধ রুটি খাইয়া বাহির হইতাম এবং অপরাহ্ণে ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতাম। সমস্তদিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না— পাছে কিছু-একটা এড়াইয়া যায়, এই আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে, পথের কোনো বাঁকে, পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো দুই-একটি ঝরনার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল্‌কুল্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম, এ-সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন। এইখানে থাকিলেই তো হয়।

আমার কাছে পিতা তাঁহার ছোটো ক্যাশবাক্সটি রাখিবার ভার দিয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে আমিই যোগ্যতম ব্যক্তি, সে-কথা মনে করিবার

হেতু ছিল না। পথ-খরচের জন্য তাহাতে অনেক টাকাই থাকিত। কিশোরী চাটুর্জের হাতে দিলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন, কিন্তু আমার উপর বিশেষ ভার দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া একদিন বাক্সটি তাঁহার হাতে না দিয়া ঘরের টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

ডাকবাংলায় পৌঁছিলে পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

বক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল। যদিও তখন বৈশাখ মাস, কিন্তু শীত অত্যন্ত প্রবল। এমন-কি, পথের যে-অংশে রৌদ্র পড়িত না সেখানে তখনো বরফ গলে নাই।

এখানেও কোনো বিপদ আশঙ্কা করিয়া আপন ইচ্ছায় পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে পিতা একদিনও আমাকে বাধা দেন নাই।

আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ। কিন্তু এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসংকোচে তাহাদের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না! বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা, এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।

আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক-একদিন, জানি না কত রাত্রে, দেখিতাম, পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দসঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

তাহার পর আর-এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম, পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে 'নরঃ নরৌ নরাঃ' মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্ত বেষ্টন হইতে বড়ো দুঃখের এই উদ্‌বোধন।

সূর্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে এক বাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর-একবার উপাসনা করিতেন।

তাহার পরে আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে আমি পারিব কেন। অনেক বয়স্ক লোকেরও সে সাধ্য ছিল না। আমি পথিমধ্যেই কোনো-একটা জায়গায় ভঙ্গ দিয়া পায়ে-চলা পথ বাহিয়া উঠিয়া আমাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম।

পিতা ফিরিয়া আসিলে ঘণ্টাখানেক ইংরেজি পড়া চলিত। তাহার পর দশটার সময় বরফগলা ঠাণ্ডাজলে স্নান। ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল না; তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ঘড়ায় গরম জল মিশাইতেও ভৃত্যেরা কেহ সাহস করিত না। যৌবনকালে তিনি নিজে কিরূপ দুঃসহ-শীতল জলে স্নান করিয়াছেন, আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য সেই গল্প করিতেন।

দুধ খাওয়া আমার আর-এক তপস্যা ছিল। আমার পিতা প্রচুর পরিমাণে দুধ খাইতেন। আমি এই পৈতৃক দুগ্ধপানশক্তির অধিকারী হইতে পারিতাম কি না নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু, পূর্বেই জানাইয়াছি, কী কারণে আমার পানাহারের অভ্যাস সম্পূর্ণ উলটাদিকে চলিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে বরাবর আমাকে দুধ খাইতে হইত। ভৃত্যদের শরণাপন্ন হইলাম। তাহারা আমার প্রতি দয়া করিয়া বা নিজের প্রতি মমতাবশত বাটিতে দুধের অপেক্ষা ফেনার পরিমাণ বেশি করিয়া দিত।

মধ্যাহ্নে আহারের পর পিতা আমাকে আর-একবার পড়াইতে বসিতেন। কিন্তু সে আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। প্রত্যূষের নষ্টঘুম তাহার অকালব্যাঘাতের শোধ লইত। আমি ঘুমে বার বার ঢুলিয়া পড়িতাম। আমার অবস্থা বুঝিয়া পিতা ছুটি দিবামাত্র ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত। তাহার পরে দেবতাত্মা নগাধিরাজের পালা।

এক-একদিন দুপুরবেলায় লাঠিহাতে একলা এক পাহাড় হইতে আর-এক পাহাড়ে চলিয়া যাইতাম; পিতা তাহাতে কখনো উদ্‌বেগ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত ইহা দেখিয়াছি, তিনি কোনোমতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধ কাজ অনেক করিয়াছি; তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু কখনো তাহা করেন নাই। যাহা কর্তব্য তাহা আমরা অন্তরের সঙ্গে করিব, এজন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন। সত্যকে এবং শোভনকে আমরা বাহিরের দিক হইতে লইব, ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইত না; তিনি জানিতেন, সত্যকে ভালোবাসিতে না পারিলে সত্যকে গ্রহণ করাই হয় না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে ফেরা যায়,

কিন্তু কৃত্রিম শাসনে সত্যকে অগত্যা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।

আমার যৌবনারম্ভে এক সময়ে আমার খেয়াল গিয়াছিল, আমি গোরুর গাড়িতে করিয়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পেশোয়ার পর্যন্ত যাইব। আমার এ প্রস্তাব কেহ অনুমোদন করেন নাই এবং ইহাতে আপত্তির বিষয় অনেক ছিল। কিন্তু, আমার পিতাকে যখনই বলিলাম তিনি বলিলেন, 'এ তো খুব ভালো কথা; রেলগাড়িতে ভ্রমণকে কি ভ্রমণ বলে?' এই বলিয়া তিনি কিরূপে পদব্রজে এবং ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি বাহনে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার গল্প করিলেন। আমার যে ইহাতে কোনো কষ্ট বা বিপদ ঘটিতে পারে, তাহার উল্লেখমাত্র করিলেন না।

আর-একবার যখন আমি আদিসমাজের সেক্রেটারিপদে নূতন নিযুক্ত হইয়াছি তখন পিতাকে পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়া জানাইলাম যে, 'আদিব্রাহ্মসমাজের বেদিতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যবর্ণের আচার্য বসেন না, ইহা আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।' তিনি তখনই আমাকে বলিলেন, 'বেশ তো, যদি তুমি পার তো ইহার প্রতিকার করিয়ো।' যখন তাঁহার আদেশ পাইলাম তখন দেখিলাম, প্রতিকারের শক্তি আমার নাই। আমি কেবল অসম্পূর্ণতা দেখিতে পারি কিন্তু পূর্ণতা সৃষ্টি করিতে পারি না। লোক কোথায়। ঠিক লোককে আহ্বান করিব, এমন জোর কোথায়। ভাঙিয়া সে-জায়গায় কিছু গড়িব, এমন উপকরণ কই। যতক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ মানুষ আপনি না আসিয়া জোটে ততক্ষণ একটা বাঁধা নিয়মও ভালো, ইহাই তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু, ক্ষণকালের জন্যও কোনো বিঘ্নের কথা বলিয়া তিনি আমাকে নিষেধ করেন নাই। যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে-পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা

দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্‌বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।

পিতার সঙ্গে অনেক সময়েই বাড়ির গল্প বলিতাম। বাড়ি হইতে কাহারো চিঠি পাইবামাত্র তাঁহাকে দেখাইতাম। নিশ্চয়ই তিনি আমার কাছ হইতে এমন অনেক ছবি পাইতেন যাহা আর-কাহারো কাছ হইতে পাইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

বড়দাদা মেজদাদার কাছ হইতে কোনো চিঠি আসিলে তিনি আমাকে তাহা পড়িতে দিতেন। কী করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিতে হইবে, এই উপায়ে তাহা আমার শিক্ষা হইয়াছিল। বাহিরের এই-সমস্ত কায়দাকানুন সম্বন্ধে শিক্ষা তিনি বিশেষ আবশ্যক বলিয়া জানিতেন।

আমার বেশ মনে আছে, মেজদাদার কোনো চিঠিতে ছিল তিনি 'কর্মক্ষেত্রে গলবদ্ধরজ্জু' হইয়া খাটিয়া মরিতেছেন— সেই স্থানের কয়েকটি বাক্য লইয়া পিতা আমাকে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি যেরূপ অর্থ করিয়াছিলাম তাহা তাঁহার মনোনীত হয় নাই, তিনি অন্য অর্থ করিলেন। কিন্তু, আমার এমন ধৃষ্টতা ছিল যে সে-অর্থ আমি স্বীকার করিতে চাহিলাম না। তাহা লইয়া অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। আর-কেহ হইলে নিশ্চয় আমাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি ধৈর্যের সঙ্গে আমার সমস্ত প্রতিবাদ সহ্য করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি আমার সঙ্গে অনেক কৌতুকের গল্প করিতেন। তাঁহার কাছ হইতে সেকালের বড়োমানুষির অনেক কথা শুনিতাম। ঢাকাই কাপড়ের পাড় তাহাদের গায়ে কর্কশ ঠেকিত বলিয়া তখনকার দিনের শৌখিন লোকেরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কাপড় পরিত, এই-সব গল্প তাঁহার কাছে

শুনিয়াছি। গয়লা দুধে জল দিত বলিয়া দুধ-পরিদর্শনের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত হইল, পুনশ্চ তাহার কার্য-পরিদর্শনের জন্য দ্বিতীয় পরিদর্শক নিযুক্ত হইল, এইরূপে পরিদর্শকের সংখ্যা যতই বাড়িয়া চলিল দুধের রঙও ততই ঘোলা এবং ক্রমশ কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছনীল হইয়া উঠিতে লাগিল— এবং কৈফিয়ত দিবার কালে গয়লা বাবুকে জানাইল, পরিদর্শক যদি আরো বাড়ানো হয় তবে অগত্যা দুধের মধ্যে শামুক ঝিনুক ও চিংড়ি-মাছের প্রাদুর্ভাব হইবে। এই গল্প তাঁহারই মুখে প্রথম শুনিয়া খুব আমোদ পাইয়াছি।

এমন করিয়া কয়েক মাস কাটিলে পর, পিতৃদেব তাঁহার অনুচর কিশোরী চাটুর্জের সঙ্গে আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

৩

বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

৪

আমাদের পিতৃদেব যখন স্বদেশের প্রচলিত পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখনো তিনি স্বদেশী শাস্ত্রকে ত্যাগ করেন নাই ও স্বদেশী সমাজকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া ছিলেন।

[illegible]

৪

পিতৃস্মৃতি

এই অধ্যায়ে মুদ্রিত পিতৃস্মৃতি রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর নামে প্রবাসী পত্রে (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯) প্রকাশিত হইয়াছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে জানা যায়, "বড়দিদির লেখা" তিনিই প্রবাসী-সম্পাদককে পাঠাইয়াছিলেন। অনুমান হয় যে রচনাটি মূলত সৌদামিনী দেবীর লেখা হইতে পারে, কিন্তু প্রবাসীতে পাঠাইবার পূর্বে আদ্যোপান্ত রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পুনর্লিখিত। এইরূপ অনুমানের অন্যতম কারণ, প্রবাসীতে প্রেরিত পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে লিখিত। রচনাভঙ্গিও লক্ষণীয়। পাণ্ডুলিপিটি পূর্বে শ্রীসীতা দেবীর অধিকারে ছিল, তিনি ইহা শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে দান করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত হইল।

১

পিতা শিলাইদহ জমিদারিতে পদ্মানদীতে তাঁহার তিন-চারিটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে গেলেন। সেখানে থাকিতেই তিনি সংকল্প করিলেন, দূরে কোথাও নির্জনে গিয়া ঈশ্বর সাধনা করিবেন। সেখান হইতেই ছেলেদের বাড়ি পাঠাইয়া তিনি সিমলায় চলিয়া গেলেন। ইহাদিগকে বাড়ি পাঠাইবার সময় তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তখনো সোম, রবি ও তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করে নাই। পিতা মনে করিয়াছিলেন, হয়তো তাঁহার বাড়ি ফেরা আর ঘটিয়া উঠিবে না।

তিনি সিমলায় যাইবার দিনকয়েক পরেই সিপাইবিদ্রোহ আরম্ভ হইল। অনেকদিন তাঁহার চিঠিপত্র পাওয়া গেল না। একটা গুজব উঠিল সিপাহীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। একে অনেকদিন চিঠিপত্র লেখেন নাই, তাহার উপর এই গুজব— বাড়ির সকলে ভাবনায় অভিভূত হইল। মা তো আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। সে এক ভয়ানক দিন গিয়াছে।

কিছুদিন পরে তাঁহার চিঠি পাওয়া গেল, তখন সকলে সুস্থ হইলেন। এ দিকে, তাঁহার সিমলা থাকার সময়েই পুণ্যেন্দ্র বলিয়া আমার একটি ভাইয়ের মৃত্যু হইল। পিতার কাছে শুনিয়াছি, পুণ্যেন্দ্র মারা যাইবার সংবাদ তিনি পান নাই কিন্তু একদিন সেই প্রবাসেই তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন পুণ্যেন্দ্র কোনো কথা না কহিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহা রাত্রির স্বপ্ন নহে ; দিনের বেলা জাগ্রত অবস্থায় তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি সেই সিমলায় থাকিতেই ছোটোকাকার মৃত্যু হইয়াছিল— তখনো তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সে-কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি।

রবির জন্মের পর হইতেই আমাদের পরিবারে জাতকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বে যে-সকল ভট্টাচার্যেরা পৌরোহিত্য প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত ছিল রবির জাতকর্ম উপলক্ষে তাহাদের সহিত পিতার অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল আমার অল্প অল্প মনে পড়ে। রবির অন্নপ্রাশনের যে পিঁড়ার উপরে আলপনার সঙ্গে তাহার নাম লেখা হইয়াছিল সেই পিঁড়ির চারি ধারে পিতার আদেশে ছোটো ছোটো গর্ত করানো হয়। সেই গর্তের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি বসাইয়া তিনি আমাদের তাহা জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। নামকরণের দিন তাহার নামের চারি দিকে বাতি জ্বলিতে লাগিল— রবির নামের উপরে সেই মহাত্মার আশীর্বাদ এইরূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল।

মা আমার সতীসাধ্বী পতিপরায়ণা ছিলেন। পিতা সর্বদাই বিদেশে কাটাইতেন এই কারণে সর্বদাই তিনি চিন্তিত হইয়া থাকিতেন। পূজার সময় কোনোমতেই পিতা বাড়িতে থাকিতেন না। এইজন্য পূজার উৎসবে যাত্রা গান আমোদ যত-কিছু হইত তাহাতে আর সকলেই মাতিয়া থাকিতেন কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ দিতে পারিতেন না। তখন নির্জন ঘরে তিনি একলা বসিয়া থাকিতেন। কাকীমারা আসিয়া তাঁহাকে কত সাধ্য সাধনা করিতেন, তিনি বাহির হইতেন না। গ্রহাচার্যেরা স্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা পিতার সর্বপ্রকার আপদ দূর করিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার কাছ হইতে সর্বদাই যে কত অর্থ লইয়া যাইত তাহার সীমা নাই।

যে ব্রাহ্মমুহূর্তে মাতার মৃত্যু হইয়াছিল পিতা তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় হিমালয় হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে মা ক্ষণে ক্ষণে চেতনা হারাইতেছিলেন। পিতা আসিয়াছেন শুনিয়া বলিলেন,

'বসতে চৌকি দাও।' পিতা সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। মা বলিলেন, 'আমি তবে চললেম।' আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমাদের মনে হইল, স্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য এ পর্যন্ত তিনি আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। মার মৃত্যুর পরে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় পিতা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফুল চন্দন অভ্র দিয়া শয্যা সাজাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ছয় বৎসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম।'

আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে যে পূজার উৎসব ছিল তাহার মধ্যে সাত্ত্বিকভাব কিছুই দেখা যাইত না। এই পূজা-অনুষ্ঠান আমোদে উন্মত্ত হইবার একটা উপলক্ষ মাত্র ছিল। আমরা ছোটোবেলায় শিব পূজা ইতু পূজা প্রভৃতি যাহা দেখিতাম তাহারই অনুকরণ করিতাম। দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমার নিকট অঞ্জলি দিয়া তবে জলগ্রহণ করিতে পাইতাম। আমার ঘরে কৃষ্ণের ছবি ছিল আমি গোপনে ফুল জল লইয়া ভক্তির সহিত সেই ছবির পূজা করিতাম।

একবার পিতা যখন সিমলা পাহাড় হইতে হঠাৎ বাড়ি ফিরিলেন, তখন বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজা। সেদিন বিসর্জন। তিনি বাড়িতে প্রবেশ না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে গিয়া বসিয়া রহিলেন— বাড়ির সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কোনোপ্রকারে ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হইলে তিনি ঘরে আসিলেন। তাহার পর হইতে আমাদের বাড়িতে প্রতিমা পূজা উঠিয়া যাইতে লাগিল। একদিন প্রাতঃকালে সত্যকে কোলে করিয়া লইয়া বসিয়া আছি; এমন সময় সেজদাদা একখানি ছোটো ছাপানো কাগজ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এই কবিতাটি মুখস্থ করিয়া লইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। সে কবিতাটি বোধ করি সকলেই জানেন—

একে একে দিবারাত করিতেছে গতায়াত
তাঁহার শাসনে চলে সকল সংসার হে।

সেজদাদা, মেজকাকীমা ও তাঁর মেয়েদের ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলিতেন। মেজকাকীমা খুব শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন কিন্তু তাঁহার মেয়েরা তাহাতে কান দিতেন না। অবশেষে তাঁহারা শালগ্রাম শিলাটিকে লইয়া আমাদের সম্মুখের বাড়িতে উঠিয়া গেলেন— আমরা একলা পড়িলাম। আমার মা বহুসন্তানবতী ছিলেন এইজন্য তিনি আমাদের সকলকে তেমন করিয়া দেখিতে পারিতেন না— মেজকাকীমার ঘরেই আমাদের সকলের আশ্রয় ছিল। তিনি আমাদের বড়ো ভালোবাসিতেন, তাঁহার 'পরেই আমাদের যত আবদার ছিল। তিনি যেদিন ভোরের বেলা গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন আমাকে তাঁহার সঙ্গে লইতেন। তিনি অল্পকালের জন্যও দূরে গেলে আমাদের বড়ো কষ্ট বোধ হইত।

এক সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ি আত্মীয়স্বজনে পূর্ণ ছিল। অবশেষে একদিন দেখিলাম প্রায় সকল আত্মীয়ই আমাদিগকে একে একে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পিতামহ তাঁহার উইলে যাঁহাদিগকে কিছু কিছু দান করিয়া গিয়াছিলেন দেখিলাম তাঁহারা আদালতে মকদ্দমা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল করাতে আমাদের বৈষয়িক দুর্গতির দিন উপস্থিত হইয়াছিল— তথাপি উইল অনুসারে যাহার যাহা প্রাপ্য ছিল তাহা পরিশোধ করিয়া দিয়া পিতৃদেব নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তাঁহার উপর এত যে অত্যাচার গিয়াছে তিনি ধীরভাবে সমস্ত বহন করিয়াছেন, কখনো ন্যায়পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। যাহারা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনাত্মীয় ব্যবহার করিয়াছে দৈন্যদশায় পড়িয়া যখনি তাহারা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে তখনি তিনি তাহাদের চিরজীবন জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের বাল্যকালে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা বড়ো একটা ছিল না। বৈষ্ণব মেয়েরা কেহ কেহ বাংলা, এমন-কি, সংস্কৃত শিক্ষা

করিত—তাহাদেরই নিকট অল্প একটু শিখিয়া রামায়ণ মহাভারত এবং সেকেলে দুই-একখানা গল্পের বই পড়িতে পারিলেই তখন যথেষ্ট মনে করা হইত। আমাদের মা-কাকীমারাও সেইরূপ শিক্ষাই পাইয়াছিলেন।

আমাদেরও প্রথম শিক্ষা একজন বৈষ্ণবীর নিকট হইতে। তাহার কাছে শিশুপাঠ পড়িতাম, এবং কলাপাতে চিঠি লেখা অভ্যাস করিতাম। ক্রমে তাহার কাছে রামায়ণ পড়া পর্যন্ত আমাদের অগ্রসর হইয়াছিল। এমন সময় পিতৃদেব সিমলা পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মন দিলেন। কেশববাবুদের অন্তঃপুরে মিশনরি মেয়েরা পড়াইতে আসিত। আমাদের শিক্ষার জন্য পিতা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বাঙালি খ্রীস্টান শিক্ষয়িত্রী প্রতিদিন আমাদিগকে পড়াইতেন এবং হপ্তায় একদিন মেম আসিয়া আমাদিগকে বাইবল পড়াইয়া যাইতেন। মাস কয়েক এইভাবে চলিয়াছিল। অবশেষে একবার পিতৃদেব আমাদের পড়াশুনা কেমনতর চলিতেছে দেখিতে আসিলেন। একখানা শ্লেটে শিক্ষয়িত্রী আমাদের পাঠ লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন—তাহারই অনুসরণ করিয়া কপি করিবার জন্য আমাদের প্রতি ভার ছিল। শ্লেটে লিখিত সেই পাঠের বানান ও ভাষা দেখিয়া পিতা আমাদের এই নিয়মের শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন।

কলিকাতায় মেয়েদের জন্য যখন বেথুন স্কুল প্রথম স্থাপিত হয় তখন ছাত্রী পাওয়া কঠিন হইল। তখন পিতৃদেব আমাকে এবং আমার খুড়তত ভগিনীকে সেখানে পাঠাইয়া দেন। হরদেব চাটুজ্যেমশায় আমার পিতার বড়ো অনুগত ছিলেন, তিনিও তাঁহার দুই মেয়েকে সেখানে নিযুক্ত করিলেন। ইহা ছাড়া মদনমোহন তর্কালংকার মহাশয়ও তাঁহার কয়েকটি মেয়েকে বেথুন স্কুলে পড়িতে পাঠাইয়া দেন। এইরূপে অতি অল্প কয়টি-মাত্র ছাত্রী লইয়া বেথুন স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়।

মেয়েদের কেবল লেখাপড়া শেখানো নয় শিল্প শেখানোর প্রতিও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। আমাদের পরিবারে যখন বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান হইতে পৌত্তলিক অংশ উঠিয়া গেল তখনো জামাইবরণ স্ত্রীআচার প্রভৃতি বিবাহের আনুষঙ্গিক প্রথাগুলিকে পিতা রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই-সকল উপলক্ষে পিঁড়াতে আলপনা দিবার ভার আমাদের উপর ছিল। ভালো করিয়া ফুল কাটিয়া আলপনা দিতে না পারিলে তিনি কিছুতেই পছন্দ করিতেন না। কোথাও নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে আমার ছোটো বোনদের চুল বাঁধার ভার আমার উপর ছিল। কেমন চুল বাঁধা হইল এক-একদিন তিনি তাহা নিজে দেখিতেন। তাঁহার পছন্দমত না হইলে পুনর্বার খুলিয়া ভালো করিয়া বাঁধিতে হইত।

মানসিক বিষয়ে পিতৃদেবের যেমন একটি সূক্ষ্মতা ছিল ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধেও সেইরূপ দেখা যাইত। কোনোপ্রকার শ্রীহীনতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সংগীত বিশেষরূপ ভালো না হইলে তিনি শুনিতে ভালোবাসিতেন না। প্রতিভার পিয়ানো বাজানো এবং রবির গান শুনিতে তিনি ভালোবাসিতেন। বলিতেন রবি আমাদের বাংলা দেশের বুল্‌বুল্‌। মন্দগন্ধ তাঁহার কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল— সুগন্ধ দ্রব্য সর্বদা তাঁহার কাছে থাকিত। ফুল তিনি বড়ো ভালোবাসিতেন। পার্ক স্ট্রীটে যখন তাঁহার কাছে ছিলাম তখন প্রত্যহ তাঁহাকে একটি করিয়া তোড়া বাঁধিয়া দিতাম। মাঝে মাঝে তাহাই ঘ্রাণ করিতে করিতে তিনি হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করিতেন, বলিতেন, ফুলের গন্ধে আমি তাঁহারি গন্ধ পাই। একদিন এইরূপে যখন হাফেজের কাব্যরসে তিনি মগ্ন ছিলেন আমাকে বলিলেন, কাগজ পেন্‌সিল লইয়া এসো। আমি তাহা লইয়া গেলে তিনি হাফেজের কবিতা তর্জমা করিয়া বলিতে লাগিলেন আমি তাহা লিখিয়া লইলাম। সেগুলি তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হইয়াছিল।

সুন্দর পরিপাটী করিয়া কোনো কাজ নিষ্পন্ন না হইলে তিনি কোনোদিন খুশি হইতেন না। আমাদের রন্ধন শিক্ষার জন্য তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন প্রতিদিন একটা করিয়া তরকারি রাঁধিতে হইবে। রোজ একটা করিয়া টাকা পাইতাম, সেই টাকায় মাছ তরকারি কিনিয়া আমাদিগকে রাঁধিতে হইত। আমাদের কোনো এক সম্পর্কের দিদিমা ভালো রাঁধিতে পারিতেন, তিনিই আমাদের শিক্ষক ছিলেন।

বাড়ির মধ্যে আমাদের প্রাত্যহিক উপাসনার একটি ঘর ছিল। পিতার আদেশ অনুসারে আমরা সাফ কাপড় পরিয়া সেই ঘর প্রতিদিন ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতাম। মহোৎসবের দিনে সেই ঘর ফুল পাতা দিয়া সাজাইতে হইত। আমরা পরমানন্দে সমস্ত রাত জাগিয়া ঘর সাজাইতাম। পিতা সকালে আসিয়া প্রথমে আমাদিগকে লইয়া সেই ঘরে উপাসনা করিয়া পরে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। সেই উপাসনার ঘরে তিনি প্রতিদিন উপাসনা করিয়া আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম পড়াইতেন; কোনো কোনো দিন আমাদিগকে লইয়া গ্রহনক্ষত্রের বিষয় আলোচনা করিতেন। এইরূপে যে-সকল উপদেশ দিতেন আমাদিগকে তাহা লিখিতে হইত। লেখা ভালো হইলে তাহার পাশে তিনি উৎসাহবাক্য লিখিয়া দিতেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বলপ্রয়োগের কোনো স্থান ছিল না; তিনি যাহা আদেশ করিতেন তাহাই আমরা সন্তুষ্টচিত্তে পালন করিতাম—তাঁহার আদেশ আমাদের পক্ষে দেববাক্য ছিল।

বাহিরের দালানে যেদিন লোকসমাগম হইত, উপাসনাসভা বসিত, মেজদাদা নিজে গান রচনা করিয়া একটি ছোটো হারমোনিয়ম লইয়া মনের সঙ্গে যখন সেই গান গাহিতেন তখন সকলেই মুগ্ধ হইত, এবং আমাদের যে কী ভালো লাগিত তাহা বলিতে পারি না। ধর্মের উৎসাহে মেজদাদা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ

আগ্রহ ছিল। স্ত্রী-স্বাধীনতা বলিয়া একখানি চটি বই তাঁহার অল্প বয়সেই তিনি লিখিয়াছিলেন। তখন মেয়েদের বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে ঢাকা-দেওয়া পালকিতে যাওয়াই রীতি ছিল— মেয়েদের পক্ষে গাড়ি চড়া বিষম লজ্জার কথা বলিয়া গণ্য হইত। একখানি পাতলা শাড়ি মাত্রই তখন মেয়েদের পরিধেয় ছিল। আমাদের বাড়িতে মেজদাদাই এ সমস্ত উলটাইয়া দিলেন। আমরা যখন শেমিজ জামা জুতা মোজা পরিয়া গাড়ি চড়িয়া বাহির হইতে লাগিলাম তখন চারি দিক হইতে যে কিরূপ ধিক্‌কার উঠিয়াছিল তাহা এখনকার দিনে কল্পনা করা সহজ নহে। পিতৃদেব নিষেধ করিলে তাহা লঙ্ঘন করা আমাদের অসাধ্য হইত কিন্তু তিনি ইহাতে কোনো বাধা দেন নাই। তিনি যখন দেখিতেন ছেলেমেয়েরা কোনো মন্দের দিকে যাইতেছে না তখন কোনো আচারের পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি নিষেধ করিতেন না।

আমার পিতার পিসতত ভাই চন্দ্রবাবু আমাদের সম্মুখের বাড়িতেই বাস করিতেন। একদিন তিনি আসিয়া পিতাকে বলিলেন, 'দেখ, দেবেন্দ্র, তোমার বাড়ির মেয়েরা বাহিরের খোলা ছাদে বেড়ায়, আমরা দেখিতে পাই; আমাদের লজ্জা করে! তুমি শাসন করিয়া দাও না কেন?' পিতা বলিলেন, 'কালের পরিবর্তন হইয়াছে। নবাবের আমলে যে নিয়ম খাটিত এখন আর সে নিয়ম খাটিবে না। আমি আর কিসের বাধা দিব, যাঁহার রাজ্য তিনিই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবেন।' ছোটো মেয়েরা ভালো করিয়া কাপড় সামলাইতে পারিত না তাই তাহাদের শাড়ি পরা তিনি পছন্দ করিতেন না। বাড়িতে দরজি ছিল— পিতা নিজের কল্পনা হইতে নানাপ্রকার পোশাক তৈরি করাইবার চেষ্টা করিতেন। অবশেষে আমাদের পোশাক অনেকটা পেশোয়াজের ধরনের হইয়া উঠিয়াছিল। আমার সেজ এবং ন বোন অধিক বয়স পর্যন্ত

অবিবাহিত ছিল বলিয়া আত্মীয়েরা চারি দিক হইতেই মাকে এবং পিতাকে তাড়না করিতেন। মা বিচলিত হইয়া উঠিতেন কিন্তু পিতা কাহারো কোনো কথা কানেই লইতেন না। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে একত্রে আহারের প্রথা পিতার সম্মতিতে আমাদের বাড়িতেই আরম্ভ হয় কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে শেষপর্যন্তই তাঁহার আপত্তি দূর হয় নাই। ব্রাহ্মণদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহে তাঁহার উৎসাহ ছিল।

এক দিকে প্রাচীন প্রথার সংস্কার ও আর-এক দিকে তাহার রক্ষণ এই দুইই তাঁহার চরিত্রে দৃঢ় ছিল। এইজন্য সমাজের আচার সম্বন্ধে তিনি যে-কোনো পরিবর্তন তাঁহার পরিবারে প্রবর্তিত করিয়াছেন সমাজের প্রতি নির্মমতাবশত তাহা করেন নাই। দেশের সমাজকে তিনি আপনার জিনিস বলিয়াই জানিতেন। সামাজিক প্রথার মধ্যে যেখানে যেটুকু সৌন্দর্য আছে তাহার প্রতি তাঁহার মমতা ছিল। এইজন্য জামাইষষ্ঠী ভাইফোঁটা প্রভৃতি লৌকিক প্রথা আমাদের বাড়িতে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। অনেকে এ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিল, তিনি শোনেন নাই। আমি যখন তাঁহাকে খবর দিতাম, আজ ভাইফোঁটা, তিনি শুনিয়া হাসিতেন, বলিতেন, 'তুমি ফোঁটা দিয়াছ— আমরা যমরাজের দুয়ারে কাঁটা দিতে যাই না, যিনি যমরাজের রাজা তাঁহার কাছে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করি।'

একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে, এখনকার দিনে নিতান্ত দুর্বল লোকও যে পথে অনায়াসে চলিতে পারে তখনকার কালের বিশেষ শক্তিমান লোকের পক্ষেও তাহা দুর্গম ছিল। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখা চাই একবার পথ বাহির হইলে সে পথে চলা তেমন কঠিন নহে, কিন্তু পথ দেখানোই শক্ত। সামাজিক উন্নতির পথে এখনকার কালের দ্রুতগামীরা পিতৃদেবের মৃদুগতিকে মনে মনে নিন্দা করিয়া থাকেন।

তাঁহারা ভুলিয়া যান, তখন যে রাস্তা ছিল তাহা পায়ে হাঁটিবার মতো, প্রত্যেক পদক্ষেপেই নিজের শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত, এখন সেখানেই অবাধে গাড়ি চলিতেছে, তাই বলিয়া রথারোহীরা যে পদাতিকের চেয়ে অধিক শক্তিশালী এমন কথা যেন তাঁহারা কল্পনা না করেন— এবং এ কথাও বোধ হয় চিন্তা করিবার যোগ্য যে তখনকার রাস্তায় অন্ধবেগে গাড়ি হাঁকাইলে আরোহীদের পক্ষে তাহা কল্যাণকর না হইতে পারিত।

একদিন কেশববাবু যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া পিতার সঙ্গে যোগদান করিলেন তখন চারি দিকে ধর্মোৎসাহ যে কিরূপ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা মনে পড়ে। পিতা তাহাকে ব্রহ্মানন্দজি বলিয়া ডাকিতেন ও পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন। বুধবারে সমাজে উপাসনার পর ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ির দালানে যখন সকলে মিলিয়া গান ধরিতেন,

"সবে মিলে মিলে গাও রে,
তাঁর পবিত্র নাম লয়ে জীবন কর সফল,
কেহ থেকো না নীরব"

তখন কী উৎসাহের আনন্দে আমাদের মন উদ্‌বোধিত হইয়া উঠিত! সমাজবাড়ি মেরামত হওয়ার উপলক্ষে আমাদের বাড়ির দালানে রাত্রিতে উপাসনাসভা বসিত— তখন আমরা ছেলেমানুষ— কিন্তু উপদেশে গানে বক্তৃতায় ঈশ্বরের প্রেমরসে মানুষের মন যে কেমন করিয়া অভিষিক্ত হইত তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই।

একবার মাঘোৎসবের আগের দিনে মামা আসিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন— 'কর্তা বলিয়া দিলেন, কাল কেশববাবুর স্ত্রী ও আর দুই জন মেয়ে আসিবেন— তোমরা তাঁহাদিকে অভ্যর্থনা করিয়া খাওয়ানো ও দেখাশোনা করিবে— কোনো ত্রুটি না হয়।' তাহার পরদিন কেশববাবু প্রতাপবাবু ও অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী আমাদের বাড়িতে আসিলেন।

কেশববাবুর স্ত্রী তিন-চার মাস আমাদের কাছে ছিলেন। তখন আত্মীয়স্বজনেরা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, কেহ আমাদের বাড়িতে আসিতেন না। সেই সময়ে কেশববাবুর স্ত্রীকে আমাদের আত্মীয়রূপে পাইয়া আমরা বড়ো আনন্দে ছিলাম। প্রথমটা তাঁহার মন বিমর্ষ ছিল —বিশেষত তাঁহার একটি ছোটো ভাইয়ের জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইত। সেই সময় সোম, রবি ও সত্য শিশু ছিল— তাহাদিগকেই তিনি সর্বদা কোলে করিয়া থাকিতেন— বলিতেন, রবিকে তাঁহার সেই ছোটো ভাইটির মতো মনে হয়। সত্য তাঁহাকে মাসী বলিতে পারিত না, 'মাচি' বলিত, তাহাতে তিনি আমোদ বোধ করিতেন। তাঁহাকে আমাদের ভগিনীর মতোই মনে হইত— তিনি যাইবার সময় আমরা বড়ো বেদনা পাইয়াছিলাম।

আমরা যখন কিছুদিন নৈনানের বাগানে ছিলাম তখন সেখানে কেশববাবুর বড়ো ছেলে করুণার অন্নপ্রাশন হইয়াছিল। তখনকার সমস্ত ব্রাহ্মদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ সমারোহে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দশ-পনেরো দিন আগে হইতে আমরা পিঁড়িতে আলপনা দিতে নিযুক্ত ছিলাম। এই কাজে আমরা প্রশংসা পাইয়াছিলাম।

চুঁচুড়ার বাড়িতে পিতার যখন কঠিন পীড়া হয় তখন আমি আর আমার ন বোন স্বর্ণ তাঁহার সেবার জন্য গিয়াছিলাম। কিন্তু পাছে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় সেজন্য তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। সেই অবস্থাতেই আমাদের শোবার খাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার কাছে থাকিয়া কেহ কোনো বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন-কি ভৃত্যদেরও কোনো অসুবিধা তাঁহার ভালো লাগিত না।

চুঁচুড়ায় থাকিতে একদিন তাঁহার জ্বর প্রবল হইয়া উঠিল, বিকাল

হইতে জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন। ইংরাজ ডাক্তার আসিয়া বলিল এই জ্বর ত্যাগের সময় বিপদের আশঙ্কা আছে, সেই সময়েই নাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারে— অতএব সাবধান থাকা আবশ্যক। রাজনারায়ণবাবু সেই রাত্রে আসিয়াছিলেন। ডাক্তার বেদানার রসে আর্সেনিক মিশাইয়া দিয়াছিলেন; আমি তাহাই কাপড়ে ভিজাইয়া তাঁহার জিভে দিতেছিলাম এবং ডাক্তার কেবলি নাড়ি পরীক্ষা করিতেছিলেন। নাড়ি দুর্বল; ভোরের বেলাটাতে ভয়ের কথা। কিন্তু সকালবেলায় জ্ঞান হইবামাত্রই তিনি উঠিয়া বসিয়া শাস্ত্রীকে বলিলেন, রাজনারায়ণবাবু আসিয়াছেন, তাঁহাকে ডাকো। শাস্ত্রী ভয় পাইলেন পাছে এই অবস্থায় কথা কহিবার চেষ্টা করিয়া দুর্বলতা বাড়িয়া যায়। রাজনারায়ণবাবু কাছে আসিয়া বসিলেন। পিতা বলিলেন, 'দেখ, আমি ঈশ্বরের আদেশ পাইলাম যে, এ যাত্রায় তুমি রক্ষা পাইলে; তোমার এখনো কাজ বাকি আছে; আমার দিকে আরো তুমি অগ্রসর হও।'

সকল কর্মই তিনি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া ও ন্যায় পথে থাকিয়া নির্বাহ করিয়াছেন। যখন পার্ক স্ট্রীটে তাঁহার কাছে ছিলাম, দেখিতাম সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি একই চৌকিতে সমানভাবে বসিয়া ঈশ্বর-চিন্তায় দিন কাটাইয়াছেন— স্নানাহার ছাড়া আর সমস্ত ক্ষণই তাঁহার মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট থাকিত। কোনো দিন যখন কোনো প্রয়োজনীয় কথা বলিতে যাইতাম তিনি বলিতেন আমি কোথায় ছিলাম, আমাকে কোথায় আনিলে— তখন মনে অনুতাপ হইত।

বয়সের শেষভাগে যখন পিতৃদেব পার্ক স্ট্রীট ও জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়াছিলেন তখনি তাঁহার কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইহার পূর্বে প্রায়ই তিনি বিদেশে নির্জনবাসে দিন যাপন করিয়াছেন। যখন চিঠিতে তাঁহার বাড়ি আসিবার খবর

আসিত তখন আমাদের এত আনন্দ হইত যে, যে লোক সংবাদ দিত তাহাকে পুরস্কার দিতাম। সকালে তিনি আমাদের সকলকে একত্র করিয়া দালানে উপাসনা করিতেন। উপাসনা হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্বে তিনি একবার আমাদের দেখিয়া লইতেন। বাহিরে গিয়া মামাকে জিজ্ঞাসা করিতেন অমুককে আজ ভালো দেখিলাম না কেন, অমুককে যেন বিমর্ষ বোধ হইল। ক্ষণকালের দৃষ্টিতে তিনি আমাদের মনের অবস্থা বুঝিয়া লইতেন। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কত কাজ করিয়াছি কিন্তু কখনো তিনি আমাদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন নাই। তিনি যখন মিষ্টস্বরে মা বলিয়া ডাকিতেন তখন সে যে কি মধুর লাগিত তাহা জীবনে কখনো ভুলিতে পারিব না। তেমন মধুর বাণী আর কাহারো মুখে তো শুনিতে পাই না। এত বড়ো বৃহৎ পরিবারকে তিনি তাঁহার স্নেহপূর্ণ মঙ্গল কামনায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং সর্ব-প্রকার সাংসারিক সুখদুঃখ ও বিরোধ-বিপ্লবের মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া নীরবে নিয়ত সকলের কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

২

পিতৃদেবের স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। একবার তাঁহার কাছে শুনিয়াছিলাম শিশু অবস্থায় মার কোলে শুইয়া তিনি ঝিনুকে করিয়া দুধ খাইতেছেন সে কথাও তাঁর অল্প অল্প মনে পড়ে। তাঁহার বালককালের একটি ঘটনা তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন— 'তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয় বৎসর হইবে। ঠাকুরঘরে গিয়া দেখি, ঘরে কেহই নাই, সিংহাসনের উপর শালগ্রাম ঠাকুর। আমি সেই শিলাটিকে আস্তে আস্তে তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া মাটিতে গড়াইয়া মনের আনন্দে খেলা করিতেছি— ও দিকে পূজারি ব্রাহ্মণ আসিয়া দেখে যে, সিংহাসনে

ঠাকুর নাই। ঠাকুর কে লইল বলিয়া মহা হুলস্থুল বাধিয়া গেছে; চারি দিকে খোঁজ খোঁজ করিতে করিতে একজন আসিয়া দেখে যে আমি তাহা লইয়া নিশ্চিন্তমনে খেলা করিতেছি। বাড়ির মেয়েরা সব ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, দেবেন্দ্র এ কি সর্বনাশ— ঠাকুরকে লইয়া খেলা! কি মহা বিপদই না-জানি ঘটিবে! পুনর্বার অভিষেক করিয়া ঠাকুরকে সিংহাসনে স্থাপিত করা হইল। তাহার পরে যাহাতে আমার কোনো অনিষ্ট না হয় সেজন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ধুম পড়িয়া গেল।'

অল্পবয়সে পিতা একবার সরস্বতী পূজা করিয়াছিলেন। কি কারণে পিতামহ তখন বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। সেই পূজায় পিতা এত প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া সমারোহ করিয়াছিলেন যে সেই পার্বণে শহরে গাঁদা ফুল ও সন্দেশ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিমাও এত প্রকাণ্ড হইয়াছিল যে বিসর্জনের সময় নানা কৌশলে তাহা বাড়ি হইতে বাহির করিতে হয়। শুনিয়াছি পূজায় এরূপ অতিরিক্ত ব্যয় পিতামহের সন্তোষ-জনক হয় নাই।

পিতামহের আমলে দুর্গোৎসব যেমন আমাদের বাড়ির সামাজিক আনন্দোৎসব ছিল এবং এই উৎসব যেমন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত, পিতার ইচ্ছা ছিল মাঘোৎসবকে তিনি সেইরূপ আমাদের বাড়ির অবারিত আনন্দ-সম্মিলনের মতো করিয়া তুলিবেন। যখন তাঁহার হাতে এই উৎসবের ভার ছিল তখন মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতেই কাজকর্ম আরম্ভ হইত; ভৃত্যেরা কাপড় পাইত, পরিবারস্থ আত্মীয়স্বজনদিগকে কাপড় দেওয়া হইত, কাঙালীবিদায়েরও বিশেষ আয়োজন হইত। পূর্বে পূজার সময়ে যেরূপ বৃহদাকারের মেঠাই তৈরি হইত এগারোই মাঘেও সেইরূপ মেঠাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। সেই বড়ো বড়ো মেঠাইয়ের স্তূপ সকালবেলা হইতে বাহিরের ঘরে টেবিলের উপর সাজানো থাকিত; যাঁহার যখন

ইচ্ছা খাইতেন—কোনো বাধা ছিল না। একবার উৎসবের দিন ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ করিয়া আসিয়া তাঁহার এক জামাতা এই মিষ্টান্নরাশির সম্মুখে দাঁড়াইয়া 'বাঃ কেয়া বাৎ হ্যায়' বলিয়া মনের উচ্ছ্বাস যেমনি প্রবল কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন, অমনি দেখিলেন সম্মুখে পিতা আসিয়া তাঁহার সেই আনন্দ-আবেগে হাস্য করিতেছেন। তিনি তো লজ্জায় মাটি হইয়া গেলেন। উৎসবের রাত্রিতেও আহারের আয়োজন অবারিত ছিল। যে যখনই আসিত আহার করিতে বসিয়া যাইত।

পয়লা বৈশাখে বর্ষারম্ভের উপাসনার পর আমরা তাহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া গিনি দিয়া আশীর্বাদ করিতেন। সেদিন দুপুরবেলায় বাদামের কুলপির বরফ তৈরি করাইয়া আমাদের জন্য পাঠাইয়া দিতেন, আমরা তাহা সকলে আনন্দে ভাগ করিয়া খাইতাম। পয়লা বৈশাখে প্রথম অরুণোদয়ে প্রত্যুষের নির্মল স্নিগ্ধতার মধ্যে মধুর গানে ও পিতৃদেবের হৃদয়গ্রাহী উপদেশে আমাদের সকলের মন আরাধনার ভক্তিরসে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত—আজ মনে হয় যেন সেই এক পবিত্র সত্যযুগ চলিয়া গিয়াছে।

যখন পিতা বক্রোটায় ছিলেন, তখন মনে আছে তিনি মাকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—দেখ, ছোটোকাকা আমাকে পত্র দিয়াছেন তুমি আর দেশ ছাড়িয়া কতদিন পাহাড়ে পর্বতে ঘুরিয়া বেড়াইবে—বাড়িতে আসিয়া বড়োলোকের ছেলেদের মতো দশ-পাঁচটি মোসাহেব রাখিয়া পাঁচ-জনকে লইয়া আমোদ-আহ্লাদে দিনযাপন কর—আত্মীয় বন্ধু ছাড়িয়া তুমি একলাটি কি করিয়া জীবন কাটাইতেছ!—তাঁহার ছোটোকাকা মনেও করিতে পারিতেন না, নিজের মন ভোলাইবার ও দিন কাটাইবার জন্য তাঁহাকে এক মুহূর্তকালও পাঁচজনের মুখাপেক্ষা করিতে হইত না।

পীড়ার সময় যখন তাঁহাকে ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছিল তখন একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'এ ডাক্তার আমার কি করিবে, আমার যিনি ডাক্তার তিনি সর্বদা আমার কাছে কাছেই থাকেন। আমি যখন একবার কাশ্মীরে পাহাড় ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলাম তখন আমার শরীর ভালো ছিল না। আমার প্রবাসের বন্ধুরা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া বলিয়া গেলেন, এখন আপনার বাহির হওয়া উচিত হইবে না— আগে শরীর সুস্থ হউক তাহার পরে যেমন ইচ্ছা করিবেন। আমি তাঁহাদের কাহারো বারণ শুনিলাম না। ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছি, কোথায় যাইব এবং কোথায় থাকিব তাহার কোনো ঠিকানা নাই। চাকরদের বলিয়া দিলাম— তোরা যেখানে পাস একটা কোনো আশ্রয় ঠিক করিয়া রাখ। তাহারা একটা ভাঙা বাড়ি খালি পাইয়াছিল। সেখানে একটা খাটিয়া পড়িয়াছিল; তাহারই উপরে তাহারা আমার বিছানা করিয়া রাখিয়াছিল। সেইখানে গিয়া আমি তো শুইয়া পড়িলাম। একে শরীর অসুস্থ, পথে কিছুই আহার করি নাই, তাহার পরে ঝাঁকানি, ক্লান্তি ও দুর্বলতায় আমাকে যেন একেবারে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। আমি খাটিয়ায় শুইয়া চোখ বুজিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল আমি যেন কাহার কোলের উপর শুইয়া আছি।— আমার বড়োই আরাম। সকালে উঠিয়া চাকরদের বলিলাম, চেষ্টা করিয়া দেখ যদি কোথাও একটু দুধ পাওয়া যায়। তাহারা দুইজনে ঘটি লইয়া দুধের সন্ধানে বাহির হইল। কিছুদূর যাইতেই দেখে একটা গাভী আসিতেছে। সেই গাভীটাকে একজন ধরিল ও আর-একজন তাহার দুধ দুইয়া লইল। সেই দুধটুকু খাইয়া মনে হইল যেন আমার জীবন ফিরিয়া আসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে আমি সারিয়া উঠিলাম এবং শরীরে বল পাইলাম। নিজের ঘরে গোরু পুষিলাম— সেই গোরু রোজ দশ সের দুধ দিত। সেই

দুধ ও তাহার ঘি মাখন খাইয়া এবং খুব করিয়া বেড়াইয়া আমি একেবারে সুস্থ হইয়া উঠিলাম। সেখানে আমার ডাক্তার কবিরাজ কে ছিল! কে-বা আমার এই দুধের পথ্য জোগাইয়া দিল!'

পার্ক স্ট্রীটে যেদিন আমরা সকল ভাইবোন মিলিয়া পিতার জন্মোৎসব করিতাম সেদিন আমাদের বড়োই আনন্দের দিন ছিল। সেদিন পরিবারের সকলেই একত্র হইতেন। তিনি মাঝখানে চৌকিতে বসিতেন, আমরা সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতাম— বড়ো দাদা সময়োচিত কিছু একটা লিখিয়া পাঠ করিতেন, রবি গান করিত। তিনি ফুল বড়ো ভালোবাসিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ফুলের তোড়া ফুলের সাজি আনিয়া উপহার দিত— আমরা ফুল দিয়া তাঁহার সমস্ত ঘরটি সাজাইয়া দিতাম। ছেলেমেয়ে জামাতা বধূ দৌহিত্র পৌত্র সকলে মিলিয়া তাঁহার কল্যাণ কামনা করিতেছে এত বড়ো মঙ্গলের সাজিভরা আনন্দ-উপহার সুদীর্ঘ জীবনের সন্ধ্যাকালে কয়জন লোকের ভাগ্যে ঘটে! আমাদের সেই আনন্দের দিন আর ফিরিয়া আসিবে না, সেই পবিত্র সৌম্য মূর্তি আর দেখিতে পাইব না।

৩

পিতামহ প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বেলগাছিয়ার বাগান য়ুরোপের ধনীদের প্রমোদকাননের অনুকরণে সাজাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। বহুমূল্য ছবি, মূর্তি, গৃহসজ্জা এবং ঝিল, কৃত্রিম পাহাড় ও চিড়িয়াখানায় তাহার সমতুল্য বাগান কলিকাতায় বোধ হয় আর ছিল না। এই বাগানে প্রতি শনিবার রাত্রে পিতামহ শহরের বড়ো বড়ো সাহেব মেমদের ভোজ দিতেন, অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুও গোপনে তাহার ভাগ লইয়া যাইতেন। তখনকার কাগজে বিদ্রূপ করিয়া একটা কবিতা

বাহির হইয়াছিল তাহার এক অংশ আমার মনে আছে—

'বেলগেছের বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝন্‌ঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা আমরা কি জানি!
জানেন ঠাকুর কোম্পানি।'

পিতামহের মৃত্যুর পরে এই বাগানে মেজকাকা এবং কাকিমা প্রায় থাকিতেন। তখন আমরা সেখানে এক-একদিন বেড়াইতে যাইতাম। সেখানে সেই ঝিলের মধ্যে পদ্মবন ও চিড়িয়াখানার পশুপাখি আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে।

কিন্তু পিতৃদেব এই বাগানের জাঁকজমকের মধ্যে থাকিতে ভালোবাসিতেন না। পলতায় গঙ্গার ধারে একটা বাগান ছিল। সেটা একটা বৃহৎ আম্রবন। সেখানে সাজসজ্জা কিছুই ছিল না, কেবল সামান্য একটি ছোটো বাড়ি ছিল। সেই আমবাগানে গিয়া তিনি প্রায় থাকিতেন। গ্রীষ্মের সময় সেখানে তিনি বন্ধুবান্ধবদের লইয়া গঙ্গায় স্নান করিতেন ও গাছ হইতে আম পাড়িয়া খাইতেন ও খাওয়াইতেন। ঐশ্বর্যভোগ তাঁহার মনের সঙ্গে মিলিত না, অকৃত্রিম সৌন্দর্যভোগেই তাঁহার আনন্দ ছিল।

পিতামহ দ্বিতীয়বার বিলাতে যাওয়ার পর বেলগেছের বাগানে সাহেবের ভোজ বন্ধ হইয়া গেল। তখন শহরের অনেক খানালোলুপ সম্ভ্রান্ত লোক পিতার ডিনার টেবিল আশ্রয় করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেন এবং জাতি বজায় রাখিয়া চলিতেন। যখন য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে অকস্মাৎ ঋণ-সমুদ্রের মধ্যে পড়িতে হইল তখন এক রাত্রেই পিতা ডিনারের সমারোহ বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজনারায়ণবাবু প্রায় তাঁহার সঙ্গে খাইতেন। সেদিন তিনি আসিয়া দেখিলেন টেবিলে ডাল রুটি ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন, এই খাইয়া আপনার

চলিবে কি করিয়া? পিতা কহিলেন, ঈশ্বর যখন যে অবস্থার মধ্যে ফেলেন তখন সেই অবস্থার মতো চলিতে পারিলে তবেই সব ঠিক চলে। এখন হইতে পিতা সংসারের সকল প্রকার খরচ সম্বন্ধেই অত্যন্ত টানাটানি করিয়া চলিতে লাগিলেন— পুরাতন চাল বজায় রাখিয়া লোকসমাজে অভিমান বাঁচাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না— এবং পিতামহ তাঁহার উইলে দরিদ্র অন্ধদের সাহায্যের জন্য যে লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ শোধ করিয়া দিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তিনি সামান্য পরিমাণ দেনাকেও অত্যন্ত ভয় করিতেন। তাঁহার ছেলেরা কেহ ঋণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্যের জন্য ধরিলে তিনি বলিতেন আমি কি চিরজীবন কেবল ঋণ শোধই করিব? সীতানাথ ঘোষ মহাশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া যখন তাঁহার কাছে কিছু ভিক্ষা চাহিতে গিয়াছিলেন তখন তিনি এককালে সাত হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন— ঋণের দুঃখ যে কত বড়ো তাহা তিনি জানিতেন বলিয়াই ঋণীর প্রতি তাঁহার সমবেদনা এত প্রবল ছিল।

পিতৃদেব ছোটো বড়ো সকল কাজেই শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার নিজের আহার নিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত কাজই ঘড়ি ধরিয়া সম্পন্ন হইত। তিনি যখন পাহাড়ে ছিলেন আমাদের বাড়িতে বাঙালি ঘরের প্রচলিত নিয়ম অর্থাৎ অনিয়ম অনুসারে নিত্যকর্মে সময়রক্ষার কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সেই-সমস্ত বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য বাড়িতে ঘণ্টা বাজাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইবার জন্য ছয়টার ঘণ্টা বাজিত। দালানে গিয়া প্রাত্যহিক উপাসনায় যোগ দিবার জন্য সাতটার ঘণ্টার আহ্বান পড়িত। স্নান করিবার সময় জানাইতে বেলা দশটার সময় ঘণ্টা বাজিত। সেই সময়ে কাছারির কর্মচারীরা আসিয়া কাজে

নিযুক্ত হইত। মধ্যাহ্নে বারোটার ঘণ্টায় আমাদের আহারের সময় জ্ঞাপন করিত। চারিটার ঘণ্টায় জানা যাইত এইবার ছেলেরা স্কুল হইতে আসিয়া আহারাদি করিবে। পাঁচটার সময় কাছারি বন্ধ হইত। অবশেষে রাত্রি দশটার ঘণ্টায় শয়নের জন্য ডাক পড়িত। এইরূপে পারিবারিক কর্মের তালটি বেতালা না হইয়া দাঁড়ায় সেইজন্য তিনি এইরূপ তালরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ভৃত্যদের মধ্যেও কর্মবিভাগ ছিল। যাহার প্রতি যে কর্মের ভার থাকিত, কেবল সেইটের সম্বন্ধেই তাহার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ছিল। এলোমেলো দায়িত্ববিহীন ভাবে কাজ হইবার জো ছিল না।

কোনো বিষয়ে তিনি কোনো প্রকার অপব্যয় ভালোবাসিতেন না। কারণ, অপব্যয় একটা প্রধান অব্যবস্থা, এবং অব্যবস্থা মাত্রই তাঁহার কাছে কুৎসিত ঠেকিত ; সেই-সমস্ত শৈথিল্যে জীবনযাত্রার যে ছন্দভঙ্গ করে তাহা তাঁহার কাছে পীড়াজনক ছিল। আমরা যখন ছোটো ছিলাম, তখন বৎসরে আমাদের যে কয় জোড়া কাপড় বরাদ্দ ছিল তাহা পুরাতন হইলে সেই পুরাতন কাপড় সরকারকে দেখাইয়া তবে আমরা নূতন কাপড় পাইতাম। এমন-কি পুরাতন সাবানের টুকরা সরকারকে না দিয়া আমরা নূতন সাবান পাইতাম না। তখনকার কালের প্রথামত পাতলা শাড়ি পরিবার হুকুম আমাদের ছিল না। আমাদের জন্য বিশেষ করিয়া ফরমাস দিয়া ফরাসডাঙা হইতে কাপড় তৈরি করাইয়া আনা হইত। জমকালো জরিজড়াও কাপড়ের বিলাসিতা পিতা পছন্দ করিতেন না— ভদ্রতারক্ষার উপযোগী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাজই তাঁহার মনঃপূত ছিল। পিতামহের আমলে পূজার সময় বৎসরে বৎসরে ছেলে মেয়ে ও বধূরা খুব দামী দামী জরি দেওয়া কাপড় পাইতেন। দুই-তিন মাস আগে হইতে বাড়িতে দর্জি কাজ করিতে বসিয়া যাইত। প্রত্যেক ছেলের

জরির টুপি, একটি স্যুট চাপকান ইজার ও একখানি রেশমি রুমাল প্রতি-বৎসর বরাদ্দ ছিল। পিতামহের মৃত্যুর পরেও এই বরাদ্দ কিছুকাল চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ঐশ্বর্যের আড়ম্বর পিতার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না বলিয়া এ-সকল প্রথা অধিককাল টিকিতে পারে নাই। অথচ যাহা যথার্থ আবশ্যক তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ছিল। তখন শীত-কালে গায়ে গরম কাপড় পরার রীতি মেয়েদের মধ্যে ছিল না, আমরা পাতলা কাপড় পরিয়াই শীত যাপন করিতাম। মিশনরি মেমরা শীতের সময় আমাদের সেই পাতলা কাপড় পরা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইত— তাহারা বলিত, তোমাদের কি শীত করে না? পিতা আমাদের জন্য রেশমের রেজাই তৈরি করাইয়া দিলেন। কিন্তু এমনি আমাদের অভ্যাস, সে রেজাই আমরা পরিতে পারিতাম না, গরম হইত, খুলিয়া ফেলিতাম। একবার শীতে আমাদের জন্য শালের জামিয়ার তৈরি করাইয়া দিলেন— কিন্তু সেও আমরা গায়ে দিতে পারিতাম না। তাহার পরে জামার ব্যবস্থা হইল। মা একবার আমার ছোটো দুই ভগিনীর নাক বিঁধাইয়া দিয়া বলিলেন, যাও, কর্তাকে দেখাইয়া নোলক চাহিয়া আনো। তিনি নাক বেঁধানো দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'এ কি সঙ সাজিয়াছ! যাও যাও খুলিয়া ফেলো! বন্য বর্বররাই তো নাক কান ফুঁড়িয়া গহনা পরে— এ কি ভদ্রসমাজের যোগ্য!' মা তাহাই শুনিয়া লজ্জায় মেয়েদের নোলক পরাইবার সাধ মন হইতে দূর করিয়া দিলেন। পূর্বে আমাদের বাড়িতে মেয়েদের কর্ণবেধের সময় সমারোহপূর্বক মেয়েদের ডাকিয়া খাওয়ানো হইত। এই কান বিঁধাইবার উৎসব পিতা উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের বাড়িতে যখন দুর্গোৎসব ছিল ছেলেরা বিজয়ার দিনে নূতন পোশাক পরিয়া প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত— আমরা মেয়েরা সেই দিন তেতালার ছাদে উঠিয়া প্রতিমা বিসর্জন দেখিতাম। তখন বৎসরের

মধ্যে সেই একদিন আমরা তেতালার ছাদে উঠিবার স্বাধীনতা পাইতাম। তখন বন্ধন এমন কঠিন ছিল যে পুরাতন চাকর ছাড়া বাহিরের অন্য কোনো পুরুষ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইত না। মেজদাদা সেই বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি যেদিন সিভিলসার্ভিসের জন্য বিলাতে যাত্রা করিবেন সেই রাত্রে আমাদের অন্তঃপুরের উপাসনা-ঘরে আমরা পরিবারের সকলে মিলিয়া উপাসনা করিয়াছিলাম। সেই উপাসনা-সভায় কেশববাবু যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমাদের সকলের বড়োই ভালো লাগিয়াছিল। তাহার পর মেজদাদা সিভিলিয়ান হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সেজদাদা সিংহল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। ছেলেবেলা হইতেই মেজদাদা অবরোধপ্রথার বিরোধী ছিলেন, বিলাত হইতে ফিরিয়া তাঁহার উৎসাহ আরো প্রবল হইয়া উঠিল। মেজবউঠাকুরানী স্বভাবতই অত্যন্ত বেশি লজ্জাবতী ছিলেন; তাঁহার সেই চিরদিনের সংকোচ দূর করিয়া দেওয়াই মেজদাদার বিশেষ অধ্যবসায় হইল। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা সকলে একসঙ্গে বসিয়া খাইবে মেজদাদার এই ইচ্ছা জানিতে পারিয়া পিতৃদেব একটি বড়ো ঘরে খাইবার স্থান নির্দেশ করিয়া আমাদের সকলের একত্রে খাওয়া নিয়ম করিয়া দিলেন। প্রথম প্রথম আমরা লজ্জায় খাইতেই পারিতাম না— অল্প কিছু মুখে দিয়া বসিয়া থাকিতাম, ক্রমে ক্রমে আমাদের লজ্জা ভাঙিল। মেজবউঠাকুরানীই বোম্বাই ধরনের শাড়ি পরা আমাদের মেয়েদের মধ্যে প্রথম প্রবর্তিত করিয়াছেন।

আমাদের বাড়িতে নাচ বা সুরুচিবিরুদ্ধ যাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু পরিবারের মধ্যে বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদে পিতৃদেব কোনোদিন বাধা দেন নাই। বাড়ির ছেলেমেয়েরা মিলিয়া আপনাআপনির মধ্যে অভিনয় করিবার উদ্দেশ্যে বড়ো ঘরে স্টেজ বাঁধিবার জন্য যখন তাঁহার অনুমতি

প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইল, তখন আমাদের মনে আশঙ্কা ছিল, কি জানি পাছে তিনি বিরক্ত হন। তিনি সম্মতি প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলে পর সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন। একবার এইরূপ পারিবারিক অভিনয় দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে যখন দেখা করিতে গেলাম তিনি আমাকে সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার একটি নাৎবউ পুরুষ সাজিয়াছিলেন ও সেই সজ্জায় তাঁহাকে সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল শুনিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রতিপালিত আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কতবার কত অপরাধই করিয়াছে, সে-সমস্ত তিনি গম্ভীরভাবে সহ্য করিয়াছেন। বাহির হইতে বলপূর্বক কাহাকেও কোনো বিষয়ে প্রতিরোধ করা তাঁহার স্বভাবসংগত ছিল না। যে আদর্শ অন্তরের মধ্যে থাকিয়া মানুষকে সত্যভাবে নিয়মিত করে তাহারই প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কৃত্রিম উপাসনা-প্রথা যেমন তিনি পরিহার করিয়াছিলেন কৃত্রিম শাসন-প্রথা তেমনি তাঁহার রুচিকর ছিল না। অথচ তিনি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সহিষ্ণুতা অক্ষমের দুর্বল সহিষ্ণুতা নহে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে তাঁহার ক্ষমতার কোথাও কোনো ব্যাঘাতের কারণ ছিল না, তাঁহারই প্রসাদের উপর সকলের নির্ভর ছিল; তাঁহাকে সকলে যথেষ্ট ভয়ও করিত। তিনি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার অনভিপ্রেত সকল কর্মকেই অনায়াসে সম্পূর্ণ নিরস্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু ধর্মের বল ছাড়া অন্য বলের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল না, এইজন্য তিনি নিজের শুভইচ্ছা প্রবর্তন করিবার জন্য অন্যের শুভবুদ্ধির অপেক্ষা করিতেন।

ব্রাহ্মধর্ম অভ্যুদয়ের পূর্বে দেশের ধর্ম ও সমাজনীতির প্রতি যখন শিক্ষিত লোকের অশ্রদ্ধা সঞ্চার হইয়াছিল তখন অনেক ভদ্র হিন্দুঘরের ছেলে খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমাদেরই কোনো

আত্মীয় যুবক এইরূপে খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আমার পিতা স্বয়ং গিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইয়া পুনরায় তাহার মতি ফিরাইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার উপদেশে দৃষ্টান্তে ও ধর্মোৎসাহে যে তখনকার অনেক যুবকের দ্বিধা দূর করিয়াছিল ও স্বদেশীয় ধর্মের উচ্চতম আদর্শের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার হিন্দুসমাজের যেখানে দুর্গতির কারণ আছে সেখানেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। একদিন আমাকে তিনি বলিয়াছিলেন, তোমাদিগকে আমি ব্যবসায়ী গুরুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছি। যাহারা অর্থলোলুপ হইয়া ধর্মকে পণ্যরূপে ব্যবহার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, মন্ত্র পড়ায় কিন্তু মন্ত্রের অর্থই জানে না, শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি যাহাদের কোনো লক্ষ্যই নাই, তাহাদিগকে ভক্তি করিয়া ভক্তির অবমাননা করা হইতে আমি তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি।

স্ত্রীলোকদিগকে তিনি বিশেষভাবে সম্মান করিতেন। যে-কোনো মহিলা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন সকলকেই মাতৃসম্বোধন করিয়া অত্যন্ত যত্ন আদর করিতেন। তাঁহারা যে যেমন কথা শুনিতে আসিতেন সকলকে তাহা বুঝাইয়া বলিয়া সকলের হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিতেন। একবার আমি কোনো আত্মীয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন তুমি সেখানে গেলে তিনি কি করিতেছিলেন? আমি বলিলাম, তিনি শুইয়া ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন না? আমি বলিলাম, না। তাহাতে তিনি বিষণ্ণ হইলেন। সেই আত্মীয়টি স্ত্রীলোকের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই বলিয়াই পিতার মনে ক্ষোভ জন্মিল।

আমাকে বলিয়াছিলেন, তোমাদিগকে আমি ব্রহ্মদ্বেষী গুরুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছি। যাহারা অর্থলোলুপ হইয়া ঈশ্বরকে অন্যরূপে প্রচার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, মন্ত্র পড়ায়, কিন্তু মন্ত্রের অর্থ জানে না, শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি যাহাদের কোনো লক্ষ্য নাই তাহাদিগকে ভক্তি করিয়া ভক্তির অবমাননা করা হইতে আমি তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি।

স্ত্রীলোকদিগকে তিনি বিশেষভাবে সম্মান করিতেন। যে কোনো মহিলা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন সকলকেই মাতৃসম্বোধন করিয়া সযত্নে বহু আদর করিতেন। তাঁহারা যে যেমন কথা শুনিতে আসিতেন সকলকে তাহা বুঝাইয়া বলিয়া সকলের হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিতেন। একবার আমি কোনো আত্মীয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন তুমি সেখানে গেলে তিনি কি করিতেছিলেন? আমি বলিলাম, তিনি শুইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন না? আমি বলিলাম, না। তাহাতে তিনি বিষণ্ণ হইলেন। সেই আত্মীয়া স্ত্রীলোকের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই বলিয়াই পিতা মনে ক্ষোভ করিলেন।

শ্রী সৌদামিনী দেবী।

পিতৃস্মৃতি' প্রবন্ধের শেষ পৃষ্ঠা

৫

মহর্ষি-প্রসঙ্গ

৭ই পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ভাষণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুদ্রিত হইয়াছে; অপর কয়েকটি ভাষণের প্রাসঙ্গিক অংশ, এবং অন্য কোনো কোনো রচনায় মহর্ষি-প্রসঙ্গ এই বিভাগে সংকলিত হইল।

১

আমার পিতা এখন চুঁচ্‌ড়োয় ফিরে গিয়েচেন—আমি তাঁর কাছে দিনকতক থেকে অত্যন্ত হৃদয়ের শান্তিলাভ করেছি—আমরা সমুদ্রতীরে থাকৃতুম এবং তাঁকে সেই সমুদ্রতীরের অস্তোন্মুখ সূর্য্যের মত বোধ হত। আমি কিছুদিন তাঁর বৃহৎ জীবনের তীরে থেকে কতকটা যেন মহত্ত্ব সঞ্চয় করতে পেরেছি। তিনি তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে যে বই লিখেচেন সেটা পড়ে আশ্চর্য্য হতে হয়। সে বইখানি একটি পরিণত মহৎ জীবনে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সেটা পড়লে আমার হৃদয়ে একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য আশার সঞ্চার হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এই একটি রীতিমত বই লেখা হল।

[১২৯৩]

২

আমার পিতা স্বভাবতই সুন্দরের উপাসক ছিলেন। জ্ঞানের দিক দিয়া ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার সহায়তা তিনি উপনিষৎ হইতে পাইয়াছিলেন —রসের দিক দিয়া সুন্দরকে সেবা করিবার উপকরণ তিনি কোন্ শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিতেন এই প্রশ্ন আপনার মনে জাগিয়াছে। ফরাসী দার্শনিক কুঁজ্যার গ্রন্থই তাঁহার অবলম্বন ছিল এ কথা ঠিক নহে—তত্ত্ব-শাস্ত্র ভক্তিবৃত্তিকে রস জোগাইতে পারে না।

বৈষ্ণব ধর্মমত ও পদাবলী আমার পিতার হৃদয়কে অধিকার করে নাই সে আমি জানি। তাঁহার রসভোগের সখা ছিলেন হাফেজ। তিনি নিজে কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছিলেন হাফেজের গানে। উপনিষৎ তাঁহার ক্ষুধা মিটাইত আর হাফেজ তাঁহার তৃষ্ণা দূর করিয়াছিল।

১৩১৬

৩

পশ্চিমদেশে যাঁরা মনীষী তাঁরা নিজের ধর্মসংস্কারের সংকীর্ণতায় পীড়া পাচ্ছেন এবং ইচ্ছা করছেন যে, ধর্মের পথ উদার এবং প্রশস্ত হয়ে যাক। সেই যাঁরা পীড়া পাচ্ছেন এবং সংস্কার কাটিয়ে ধর্মকে তার বিশুদ্ধ মূর্তিতে দেখবার চেষ্টা করছেন তাঁদের মধ্যে স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকও একজন। খ্রীস্টধর্ম যেখানে সংকীর্ণ সেখানে ব্রুক তাকে মানেন নি। তাঁর Onward Cry নামক নূতন বইটির প্রথম উপদেশটি পাঠ করলেই সেটা বোঝা যাবে।

আজকে যাঁর দীক্ষার সাম্বৎসরিকে আমরা এসেছি তিনি অন্‌ওআর্ড ক্রাই শুনতে পেয়েছিলেন। যে সময়ে আমাদের দেশে ধর্মকে সমাজকে চারি দিক থেকে নানা আচার ও প্রথার বন্ধনে বেঁধেছিল, তাকে সংকীর্ণ করে রুদ্ধ করে রেখেছিল, সেই সময়ে তিনি এই আহ্বান শুনে জেগে উঠলেন। চারি দিকের এই রুদ্ধতা, এই বেড়াগুলো, তাঁকে অত্যন্ত বেদনা দিয়েছিল। তিনি যখন আকাশে উড়তে চেয়েছিলেন তখন পিঞ্জরের প্রত্যেকটি শলাকা তাঁকে আঘাত করেছিল। তিনি জীবনকে প্রতিদিন অগ্রসর করবেন, প্রতিদিন অনন্তের আস্বাদ আপনার ভিতর থেকে পাবেন, তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা সেদিনকার সমাজে বড়োই দুর্লভ ছিল। সকলেই নিজ নিজ প্রচলিত অভ্যাসে তৃপ্ত ছিল। এই ৭ই পৌষের দিন তিনি তাঁর দীক্ষার আহ্বান শুনেছিলেন। সে আহ্বান এই মন্ত্রটি: ঈশাবাস্য-মিদং সর্বং। দেখো, তাঁর মধ্যে সব দেখো। এই আহ্বান, এই দীক্ষামন্ত্রই তো এই আশ্রমের মধ্যে রয়েছে। উপনিষদের এই মন্ত্র, এ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, এ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে না। এ বাণী দেশে দেশান্তরে নির্ঝরধারার মতো যুগে যুগে প্রবাহিত হয়ে চলতে থাকবে। দেখো, তাঁর মধ্যে সব দেখো।

সেইজন্য আজ আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে যে, মহর্ষির জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সমাজে হয় নি, তা এই আশ্রমে হয়েছিল। বিশেষ সমাজের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল সংযুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সেইখানেই তাঁর চিরজীবনের সাধনা তার বিশেষ সার্থকতা লাভ করে নি, এই আশ্রমের মধ্যেই তার সার্থকতা সম্পূর্ণ হয়েছিল। 'আরো'র দিকে চলো' সেই ডাক তিনি শুনে বেরিয়েছিলেন; সেই মন্ত্রে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন; এবং সেই ডাকটি, সেই মন্ত্রটি তিনি আমাদের মধ্যে রেখে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এসো, এসো, আরো পাবে।' অনন্তস্বরূপের ভাণ্ডার যদি উন্মুক্ত হয়, তবে তার আর সীমা কোথায়? তাই আমাদের দেখতে হবে যে, আমরা যেন সেই পথে তাঁর অনুসরণ করি যে পথ দিয়ে তিনি চলে গিয়েছেন। জ্ঞানে প্রেমে ধর্মে সকল দিকে যেন মুক্তির পথেই ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকি। এ কথা ভুলবার নয় যে, এ আশ্রম সম্প্রদায়ের স্থান নয়, এখানে সমস্ত বিশ্বের আমরা পরিচয় পাব। এখানে সকল জাতির সকল দেশের লোক সমাগত হবে। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রকে, সমস্তকে ঈশ্বরের মধ্যে দেখার মন্ত্রকে আমরা কোথাও সংকোচ করব না। আমাদের অগ্রসরের পথ যেন কোনোমতেই বদ্ধ না হয়।

১৩২০

৪

আমার পিতার ধর্মসাধনা তত্ত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। অর্থাৎ তাঁহার সাধনা খালকাটা জলের মতো ছিল না, সে ছিল নদীর স্রোতের মতো। সেই নদী আপনার ধারার পথ আপনি কাটিয়া সমুদ্রে গিয়া পৌঁছে। এই পথ হয়তো বাঁকিয়া ঘুরিয়া যায়, কিন্তু ইহার গতির লক্ষ্য

আপন স্বভাবের বেগেই সেই সমুদ্রের দিকে। গাছ আপন সকল পাতা মেলিয়া সূর্যালোককে সহজেই গ্রহণ করে এবং আপন জীবনের সহিত তাহাকে মিলিত করিয়া আপনার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত করিয়া তুলে। এই গাছকে বাধার মধ্যে রাখিলেও সে স্বভাবের একাগ্র প্রেরণায় যে-কোনো ছিদ্রের মধ্য দিয়া আপন আকাঙ্ক্ষাকে সূর্যালোকের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়, এই আকাঙ্ক্ষা গাছটির সমগ্র প্রাণশক্তির আকাঙ্ক্ষা।

তেমনি বুদ্ধিবিচারের অনুসরণে নয় কিন্তু আত্মার প্রাণবেগের ব্যাকুল অনুধাবনেই পিতৃদেব সমস্ত কঠিন বাধা ভেদ করিয়া অসীমের অভিমুখে জীবনকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন।

১৩২৬

৫

সন্ধ্যা হয়েছে। উৎসবের দিন অবসান হল। সমস্ত দিন নানা শব্দে নানা দৃশ্যে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে, আবার তাকে উৎসবের মূল কথায় ফিরিয়ে আনতে হয়।

আমাদের জীবনও তো নানা বিক্ষেপে পরিপূর্ণ। কিন্তু মোটের উপর জীবন কি একটি উৎসব নয়? এর উৎসবে আকাশে কত আলো জ্বলেছে, পৃথিবীতে ঋতুর পর ঋতু কত ফুলকাটা আস্তরণ বিছিয়েছে! মন যে নানা চিন্তায় এবং শক্তি যে নানা কর্মে ধাবিত হয়েছে তার গৌরব তার আনন্দ কি কম? তার পরে সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদের নানা অভিজ্ঞতায় নিজের চৈতন্যকে যে নানা রঙে রঙিয়ে দেখা গেল সেও তো আমাদের উৎসবেরই অঙ্গ।

যে মানুষ এই জীবন-উৎসবের মূল সুর থেকে দুঃখ বিপদ আঘাত ক্ষতিকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে তাকেই আর সব-কিছু হতে বড়ো করে দেখেছে তাকেও জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীতে জীবননাট্যের শেষে যখন মৃত্যুর যবনিকা পড়ল তখন কি সকল দুঃখ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল না? দুঃখ তাপ আমাদের কল্পনায় যখন চিরস্থায়িত্বের ভান করে তখনই সে বিভীষিকা; কিন্তু তার পরে দিনের শেষে? তখন তার চিহ্নই বা কই, তার বেদনাই বা কোথায়?

এই উপলব্ধির শুধু মূল্য নয়, এর একটা নিগূঢ় আনন্দ আছে; সে কথা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি মানুষ সাহিত্যে সংগীতে চিত্রকলায় এই-সমস্ত বেদনাকে নানা রসে নানা রূপে স্থায়ী করে তুলছে। তার কারণ, মানুষ জানে জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ একটা বড়ো উৎসবেরই পালা— তার কোনোটাই নিজের মধ্যেই একান্ত এবং বিচ্ছিন্ন নয়, সমস্তটা জড়িয়ে একটা মস্ত প্রকাশ।

জীবনের সেই মূলগত ঐক্যকে সমগ্রতাকে সংশ্লিষ্টভাবে যিনি উপলব্ধি করলেন তিনিই তাকে পুরোপুরি ভোগ করলেন। যে মানুষ আমোদে-প্রমোদে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়াল কিম্বা দুঃখশোকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল, সে পেলে না।

জীবনের সেই আনন্দময় ঐক্যকে কে স্পষ্ট করে দেখতে পায়? যে আপনার জীবনের অর্থকে একটি পরমানন্দময় একের মধ্যে গভীরভাবে জেনেছে। সেই তো জোরের সঙ্গে বলতে পারে—

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ

‘কোনো জায়গায় কোনো গতি বা প্রাণক্রিয়া কিছুমাত্র থাকত না, আকাশে যদি আনন্দ না থাকত।’

জীবনকে যে মানুষ নিজেরই মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দেখছে সে জীবনের সূত্র হারিয়ে ফেলেছে, সে জীবনের সব-কিছুকেই বিচ্ছিন্ন করে বোধ করছে, এইজন্যেই আঘাত-অভিঘাতে সে কেবলই এত বেশি নাড়া খাচ্ছে।

পৃথিবীতে যাঁরা উৎসবকে সম্পূর্ণ করেছেন, তার সমস্ত সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদকে অসীমের মহিমায় জ্যোতির্ময় করে দেখিয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকেই নিজের জীবনের সুর মিলিয়ে নিতে হবে।

সেইজন্যে আজ যাঁর দীক্ষার সাম্বৎসরিক দিন তাঁর জীবনকে স্মরণ করি। মৃত্যুর মহা অবকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণ করে দেখবার সুযোগ আমাদের এসেছে। আজ আমরা স্পষ্ট করেই বুঝতে পারছি— সত্যং জ্ঞানমনন্তং এই যে মন্ত্রটি আমরা উচ্চারণ করি মাত্র, এই মন্ত্রটিকে দিনে দিনে তিনি আপনার জীবনের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এই মন্ত্রই তাঁর সমস্ত সুখ দুঃখ সমস্ত কর্মকে নিয়ে তাঁর জীবনকে এক সূত্রে গেঁথে তুলেছে।

মানুষের প্রকৃতিতে যেমন ভুলভ্রান্তি সম্ভবপর তাও তাঁর ঘটেছে, দুঃখে সুখে তাকে যেমন ক্ষুব্ধ করে তাও তাঁকে করেছে, কিন্তু সে-সমস্তকে অতিক্রম করে উঠেছে তাঁর জীবনে এই কথাটি—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

এমন করে যাঁর জীবন অখণ্ড হয়েছে, অসীমের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তাঁর সেই জীবন মানুষের ইতিহাস থেকে আর ভ্রষ্ট হতে পারে না। সেই জীবন অমৃতের মন্দিরে অর্ঘ্যরূপে আহরণ করা হয়েছে কিনা এইজন্য সেই নৈবেদ্য রয়ে গেল। এখন হতে সমস্ত মানুষেরই সে। তাই আজ আমরা তাঁর সেই জীবন থেকে জীবনের অর্থ লাভ করবার জন্যে এসেছি। সেই অর্থটি মহোৎসবের সাজেই আমাদের কাছে আসুক, মহোৎসবের

সুরেই আমাদের কানে বাজুক এবং বাধা কাটিয়ে দিয়ে আমাদের জীবনকেও উৎসবময় করে তুলুক।

১৩২৬

৬

আজকের মতো এমনই এক সাতই পৌষের শুভ প্রভাতে দিব্য আলোকের সাড়া পেয়ে অমৃতস্বরূপের দীক্ষা পেয়ে একজন সাধক এ কথা বলতে পেরেছিলেন যে এই উপকরণরুদ্ধ সংসারেই মানুষের জীবনযাত্রার অবসান নয়, তাকে এর বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। নিজের খাদ্যের মধ্যেই চিরবন্দী কীটের মতো মানুষ বাস করলে চলবে না। তিনি এ কথা একদিন উপলব্ধি করে সেই অমৃতলোকের আলোকেতে এই দীক্ষার মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন যে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

সেই পূর্ণস্বরূপের দ্বারা সকল চরাচর পূর্ণ হয়ে রয়েছে, ত্যাগের দ্বারা নয়। আপনাকে যখনই সম্পূর্ণ উৎসর্গ করতে পারবে তখনই বেঁচে যাবে —অমৃতকে লাভ করবে। তিনি সেই অমৃতস্বরূপের স্পর্শ সেদিন লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন, তাই তিনি জীবনের শোক দুঃখ ক্ষতির আঘাতে আহত হন নি। তিনি অসীমের রসাস্বাদ লাভ করে পরিত্রাণের এই দীক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

সেই দীক্ষামন্ত্রের বীজ আজ আশ্রমে অঙ্কুরিত হোক, সেই বীজের অঙ্কুর কালক্রমে এখানে ছায়াতরুরূপে বর্ধিত হোক। তিনি এখানে সপ্তপর্ণী তরুতলে বেদীরচনা করেছিলেন, তিনি অমৃতের পুত্র এই গৌরব

উপলব্ধি করে বলেছিলেন যে 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ আত্মার শান্তি।' তাঁর সেই ধ্যানের বেদী তিনি এ দেশে স্থাপন করে গিয়েছেন। আজ আশ্রমের সেই বড়ো আদর্শের মহাতরুতলে দেশবিদেশ থেকে সকলে সমবেত হয়েছেন। আশা আছে যে তাঁরা তাঁদের জীবন দিয়ে নূতন বেদী রচনা করে তুলবেন— সেই সুপ্রশস্ত বেদীতলে দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রী এসে মিলিত হবে। আজকার উৎসবের দিনে সেই পরম আনন্দের অপরিসীম আশা সঞ্চারিত হোক, যে আশাতে সৃষ্টির মন্ত্র নিহিত আছে। আজ হৃদয় পূর্ণ করে সেই আশার বার্তাকে ঘোষণা করবার দিন— সেই আশাই আমাদের সম্বৎসরের কর্মে পাথেয় স্বরূপ হয়ে বিরাজ করুক।

১৩৩০

৭

অনেক সময় প্রিয়জনের মৃত্যুতে যে বৈরাগ্য আনে তার মানে হচ্চে এই যে, তখন আহত প্রাণ এমন কিছুতে বাঁচতে চায় যার ক্ষয় নেই বিলুপ্তি নেই। পিতৃদেবের জীবনীর প্রথম অধ্যায়ে সেই কথাটাই পাই। মৃত্যু যখন জীবনের সামনে আসে তখন এই কথাটাই প্রশ্ন করে, 'তুমি অমৃত কী পেয়েছ, আমি যা নিলুম তার ভিতরকার কি বাকী আছে। কিছুই যদি বাকী না থাকে তা হলে সম্পূর্ণ ঠকেচ।' প্রাণ প্রাণকেই চায়, সে কোনোমতেই মৃত্যুর দ্বারা ঠকতে চায় না— যেই ঠিকমত বুঝতে পারে ঠকছি অমনি ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠে 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম।'

১৯২৬

৮

আমার আট-নয় বছর বয়সে গঙ্গাতীরের এক বাগানে কিছুকালের জন্যে বাস করতে গিয়েছিলাম। গভীর আনন্দ পেলাম। গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহু দেশ বহু কাল ও বহু চিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়-বাণী আছে। হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী। সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকাল-ক্রমাগত জ্ঞান ধর্ম তপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।

তার পর আর কয়েক বৎসর পরেই পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয় পর্বতে নিয়ে যান। আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখেছি, আর হিমালয় পর্বতকে। উভয়ের মধ্যেই ভাবের মিল ছিল। হিমালয়ে এমন একটি চিরন্তন রূপ যা সমগ্র ভারতের— যা এক দিকে দুর্গম, আর-এক দিকে সর্বজনীন। আমার পিতার মধ্যেও ভারতের সেই বিদ্যা চিন্তায় পূজায় কর্মে প্রত্যহ প্রাণময় হয়ে দেখা যাচ্ছিল যা সর্বকালীন, যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কার্পণ্যমাত্র নেই।

১৩৩৪

৯

আজকে ৭ই পৌষও একটি দীক্ষা-দিনের সাম্বৎসরিক। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ এইদিনে যে দীক্ষা নিয়েছিলেন, সেটাকে আশ্রয় করে এই আশ্রম গড়ে উঠেছে, বিচিত্র হয়ে উঠেছে, যেমন করে সূর্যের আলোক সমস্ত জীবমণ্ডলীকে জাগ্রত করে রেখেছে, সজীব করে রেখেছে, ফুলে ফলে, পশুতে পক্ষীতে বিচিত্র করে রেখেছে, তেমনই করে এই নির্জন প্রান্তরের

মাঝখানে, এই তরুশূন্য ভূমিখণ্ডে তাঁর দীক্ষার আলোক যখন এসে স্পর্শ করল, তখন ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বৎসরে বৎসরে বিচিত্র কল্যাণরূপ সে উদ্‌বোধিত করল। ঠিক কোন্ ভাবের উপর কোন্ সত্যের উপর এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত, সে কথাটি আজ আমরা স্মরণ করব।

১৩৩৫

১০

আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর-আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র-দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে। আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে। যেখানেই গণ্ডী দেওয়া হয়েছে সেখানেই আমি বনিবনাও করতে পারি নি কখনো। যে অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু, পিতৃদেব সেজন্য কখনো ভর্ৎসনা করতেন না। তিনি নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন করে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। গভীরতর জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতা আমারও ছিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে কখনো কখনো তিনি বেদনা পেয়েছেন। কিছু বলেন নি।

বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তি-দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব-কিছু গ্রহণ করতে পারি নি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থভাবে না; বারংবার

সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে।

১৯৩৩

১১

আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।[১]

১২

আমার পিতৃদেব একদিন যখন মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না, তখন বাতাসে একটি ছিন্নপত্র তাঁর সামনে উড়ে এসেছিল— পণ্ডিতকে ডেকে সেই পত্রলিখিত ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্ শ্লোকের অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ক্রমশ

---

১ মহর্ষির ব্যবহৃত একটি ঘণ্টার পিছনে হাফেজের দুই ছত্র শ্লোক উদ্ধৃত আছে। তাহার নীচে রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ আছে। ঘণ্টাটি রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে রক্ষিত। ফার্সি মূল কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ মুদ্রিত হইল :

ম-রা দর্ মন্‌জিল্-ই-জানাঁ, চি
অমন্-উ-অয়শ্, চুঁ হর্‌দম্
জ়ারাস্ ফর্‌য়াদ্ মী-দরদ্, কি বর্-বন্দীদ মহম্মল্-হা।

সখার সদনে যেতে কত না আরাম
কত সুখ হবে সেথা লাভ।
এই বলি হেথা ঘণ্টা বাজে অবিরাম
বাঁধো তবে তব আস্‌বাব॥

—ফার্সি লিপ্যন্তর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় -কৃত

এই শ্লোকের সব কয়টি শব্দের অর্থই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তাঁর জীবনের পাতার পর পাতায় সেই অর্থ ফুটে উঠতে লাগল— এই একটি মাত্র শ্লোক ধীরে ধীরে তাঁর সংসারকে জীবনকে আচ্ছন্ন করে দিল, আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে ক্রমে তিনি নির্মল আনন্দের অধিকার লাভ করলেন। আজ ৭ই পৌষে তারই উৎসব।

১৩৪২

১৩

অতি বড়ো শোক ও বেদনার মধ্যে পিতামহীর মৃত্যুর পর পিতা আমার শান্তি চেয়েছিলেন। তাঁর সেই পীড়িত ও শোকাতুর চিত্ত আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েছিল; তিনিও প্রচলিত ধর্মের বাঁধন ছিঁড়ে এই উপনিষদের দ্বারে, সীমার ঊর্ধ্বে গিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করার জন্যে এসেছিলেন। মুক্তির জন্যে তিনি রামমোহনের কাছে গিয়েছিলেন।

১৩৪৩

১৪

এই আশ্রমে যিনি নিজের সাধনার আসন প্রতিষ্ঠিত করেন আমার সেই পিতৃদেবের তরুণ জীবনে মৃত্যু-শোকের অন্ধকার নিবিড় হয়ে আক্রমণ করেছিল। তিনি সেই অন্ধকারকে অপসারিত করে একান্তভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে অমৃতের সন্ধান করেন। তাঁর জীবনীতে এ সময়ের বর্ণনায় বলেছেন যে, গভীর শোক সূর্যের জ্যোতিকে তাঁর কাছে কালিমায় আবৃত মনে করেছিল। তিনি তাতে শান্ত থাকতে পারেন নি। তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন, তাঁর অসামান্য অতুল ধন-সম্পদের মধ্যে বিলাসিতার উপকরণ

পুঞ্জীভূত ছিল। তার মধ্যে থেকে তিনি মনে সান্ত্বনা পান নি। এই ধনবিলাসের দুর্গ থেকে মুক্তিলাভের কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু সহসা দারুণ আঘাতে তাঁর কাছে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হল। সংসারের আমোদ ও আরামে তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মাল, মৃত্যু-শোকের আঘাত পেয়ে তিনি একান্ত মনে সন্ধান করতে লাগলেন কিরূপে মৃত্যুর অধিকৃত সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবেন। সে সময়ে যে-বাণী তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিল তা এই— 'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ, যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ', সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো, যাঁকে জানলে মৃত্যু ব্যথা দিতে পারে না।

মহর্ষির মনে মৃত্যু-শোকের ভিতরে অমৃতপিপাসু আত্মার আকাঙ্ক্ষা জাগল। যে অহং মানুষকে নিজের দিকে টানে এবং আপন পুঞ্জীভূত উপকরণে অসীমকে অন্তরালে ফেলে, তাকে অপসারিত করে দিয়ে তিনি মহান পুরুষকে জানতে পারলেন। তখন তাঁর যে কত ভার লাঘব হয়ে গেল, তা জীবনীতে লিখে গেছেন।

জীবনের এই অনুভূতি যখন তাঁর কাছে সুস্পষ্ট, তখন অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁর ধন-সম্পদ ধূলিসাৎ হল, পৈত্রিক ব্যবসায় ঋণের দায়ে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি সহজে এই দারিদ্র্যকে বরণ করে নিতে পেরেছিলেন। আমরা দেখতে পাই যে মানুষের অহং যখন উপকরণ নিয়ে আসক্ত থাকে তখন সে দারিদ্র্যের ভার সইতে পারে না। কিন্তু পিতৃদেবকে এই দারিদ্র্য পীড়া দেয় নি। যিনি আবাল্য ধনবিলাসে বেড়ে উঠেছেন, তিনি সেই ধনের অভাবদুঃখকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অবিচলিত হতে পেরেছিলেন, তার কারণ আত্মা যখন আপন আনন্দে পূর্ণ থাকে তখন কোনো বোঝাই তাকে অবনত করতে পারে না। মহর্ষি তাঁর জীবনে সেই মুক্তিলাভ করেছিলেন। তিনি বিপদকালে অকাতরেই ঋণভার মোচন করে দিলেন। বিষয়ী বন্ধুরা বলেছিলেন নানা কৌশলে এই

ঋণদায় হতে অব্যাহতি পেতে কিন্তু তিনি বললেন, 'যায় যাক্ সব কিছু ক্ষতি নেই, দুঃখ নেই।' তিনি পিতার ট্রাস্ট সম্পত্তি বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু তাও মহাজনদের হাতে সঁপে দিলেন। তিনি বহু আয়াসে পর্বত-প্রমাণ ঋণ শোধ করলেন।

আমরা মহর্ষির জীবনের আর-একটা দিক দেখতে পাই। তিনি বলেন নি যে সংসারের সকল কর্তব্যের বন্ধনকে ছিন্ন করে বৈরাগ্য সাধন করতে হবে। তিনি গৃহী ছিলেন। তিনি বলেছেন যে সংসারের মধ্যে বাস করেই আসক্তির বন্ধন ঘোচাতে হবে। 'ফললাভে আসক্ত না হয়ে কর্ম করতে হবে' গীতার এই বাণী তিনি তাঁর জীবনে প্রতিপালন করেন। তিনি বলেন যে মানুষ সংসারের কর্তব্য পালন করবে কিন্তু মনকে মুক্ত রাখবে। মানুষ যখন পূর্ণ স্বরূপকে লাভ করে তখন সংসার তাকে ক্ষতির পীড়া দেয় না, দারিদ্র্যে তার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে না। তাই মহর্ষির জীবনে দেখতে পাই, সুনাবিক যেমন তরঙ্গসংকুল সমুদ্রে ভীত না হয়ে উত্তীর্ণ হবার উদ্যোগ করে, তেমনি তিনি সংসারের শোকদুঃখের তরঙ্গে দোলায়মান হয়েও জীবন-তরণী পরিচালনা করতে কুণ্ঠিত হন নি। তিনি বলেন সংসারধর্ম পালন করতে করতে তৎসত্ত্বেও মুক্তি পেতে হবে সংসারের এই শিক্ষা। প্রমাণ করতে হবে মানুষ কেবল দেহমন নিয়েই কাল যাপন করবে না, দেহমনের অতীত যে আত্মা তারই আত্মিক ধর্ম তাকে রক্ষা করতে হবে। তাকে সংসারের কর্তব্যের মধ্য দিয়েই প্রমাণ করতে হবে যে সে পশুধর্মের অতীত।

আমাদের দেশবাসীরা বলে থাকেন যে এ-সব মুনি-ঋষির কথা। আমরা সংসারী, আমরা পবিত্র ও মুক্ত হতে পারি না। কিন্তু এমন কথা মানুষের আত্মাবমাননার কথা। সংসার ও সন্ন্যাসকে বিভক্ত করা মানুষের শ্রেয়ঃ পথ নয়। গৃহী মানবকেই সন্ন্যাসী হতে হবে এবং

নিরাসক্ত হয়ে সংসারধর্ম পালন করতে হবে। আজকার দিনে পশ্চিমে ঘোর দুর্গতির কাল ঘনিয়ে এসেছে, দেশে-দেশে মানুষের মনে হিংস্রতার ও দ্বন্দ্বের অন্ত নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সমাজকে যদি বলি যে বিজ্ঞানের পাঠশালা বন্ধ করে গিরিগুহায় অরণ্যে চোখ বুজে বসে থাকো তবে মিথ্যা বলা হবে। এ যেমন নিরর্থক, তেমনি যদি বলা যায় যে লুব্ধ স্বার্থকে বিস্তার করো, বিজ্ঞানের অস্ত্রে দুর্বলকে মারো, সেও তেমনি মিথ্যা কথা। কিন্তু বলতে হবে যে সংসারের সকল কর্তব্য পালনের মধ্যেই মানুষের আত্মিক শক্তিকে জয়যুক্ত করো। সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করো, কিন্তু নিরাসক্তভাবে, আত্মার উদার লোকে সভ্যতাকে উন্নীত করো। আজকের দিনে এ কথা বলে লাভ নেই যে ধন-সম্পদের আহরণ বন্ধ করো, যা-কিছু সব ত্যাগ করো, কিন্তু মানুষকে বলতে হবে যে ঐশ্বর্য-সাধনার ভিতর দিয়েই সন্ন্যাসী হও, সংসারের মধ্যে থেকেই তোমার মাহাত্ম্যের পরিচয় দাও।

একদা ভারতবর্ষের সাধক সংসারের মধ্যে বাস করেই এই আধ্যাত্মিকতার সাধনা করেছিলেন। তাঁরা গৃহী ছিলেন। পরবর্তী যুগে এই সাধনাপথের পরিবর্তন হল, মানুষ অঙ্গে বিভূতি মেখে জনসমাজ থেকে দূরে গিয়ে আপনাকে শূন্যের মধ্যে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু প্রাচীন যুগে মানুষ যে নিভৃত নির্জনতায় সাধনার আসন পেতেছিলেন সেখানেও সংসারীদের যাতায়াত ছিল। সব ত্যাগ করে চলে যেতে হবে মানুষের পক্ষে এ কথা সত্য হতে পারে না। সংসারের তিমিরান্ধকারের মধ্য হতেই আলোকের পথ আবিষ্কার করতে হবে, জ্যোতির্ময় পুরুষকে জানতে হবে।

আমার জীবনের একটা সৌভাগ্যের কথা ভেবে আশ্চর্য লাগে, সে কথা আজ বলতে চাই। এই আশ্রমের প্রারম্ভে আমাকে অসাধ্য ঋণ-ভার ও দারিদ্র্যের বোঝা বহন করতে হয়েছে। আজকের এই প্রতিষ্ঠান

স্থাপন অকস্মাৎ ও সহজে হয় নি, এর পিছনে অনেক কৃচ্ছ্রসাধ্য আয়োজন ও চেষ্টার ইতিহাস আছে। যখন এ স্থাপিত হয় সে সময়ে আমার নিজের সম্পত্তি ছিল না, দুর্বহ ঋণের বোঝা ছিল। সেই অবস্থাতেই নিজেকে সমস্ত কর্মভার এবং সকল ছাত্র ও শিক্ষকের ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে। কিন্তু এই কাজ আমার সহজ হয়েছিল, কারণ আমার কর্তব্যের প্রবাহ সহজেই আমাকে আমার নিজের থেকে সর্বদা সরিয়ে রেখেছিল। আশ্রমের এই সুদীর্ঘ ৫০ বছরের ইতিহাসে আমাকে অনেক শোক ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। দেশের লোকের ঔদাসীন্য ও কুৎসা থেকে আমি নিষ্কৃতি পাই নি, এই প্রতিষ্ঠান চালাতে গিয়ে আত্মীয়মণ্ডলী থেকে দূরে পড়ে গিয়েছি। প্রতিকূলতার অন্ত ছিল না, কারণ বিষয়ীভাবে এই বিদ্যায়তন চালানো যথার্থই মূঢ়তা বলা যেতে পারে। তবু এই দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্যায় নিন্দা ও অকারণ উপেক্ষার পীড়ন সহ্য করা আমার কাছে সহজ হয়েছে তার একমাত্র কারণ যে, যে অহংকারের ভার অহংকে পীড়িত করে কর্মের প্রেরণাবেগে সে আপনিই কাঁধ থেকে নেমে গিয়েছিল। যারা পর তারা আমার আত্মীয় হয়েছিল, যারা বাইরের তারা এসেছিল ভিতরে। কঠিন শোক দুঃখ আমাকে আক্রমণ করেছিল কিন্তু এই আশ্রম আমাকে পরাভব থেকে রক্ষা করেছে।

মানুষ আপনার কৃতিত্ব প্রমাণ করবার জন্য যখন কর্মের আয়োজন করে তখন দ্বন্দ্বের অন্ত থাকে না, কারণ কর্মক্ষেত্র তখন অহং ঘোষণার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। আজ উৎসবের দিনে আমরা এই কথা বলব যে এখানকার কর্মপ্রচেষ্টা ক্ষুদ্র আপনকে প্রচারের প্রয়াস নয়, আত্ম-উপলব্ধির সাধনা। এই আদর্শ আমাদের কর্মকে উদ্‌বুদ্ধ করুক, তবেই বিদ্যালয়ে ও আমাদের চারি দিকের পল্লীমণ্ডলে আমাদের কর্মব্রত সত্য হয়ে উঠবে।

১৩৪৩

৬

চিঠিপত্র

বালকবয়সে রবীন্দ্রনাথ পিতাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন ও তাহার যে উত্তর পাইয়াছিলেন জীবনস্মৃতিতে 'পিতৃদেব' অধ্যায়ে তাহার কথা বিবৃত আছে; দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের 'জীবনস্মৃতি' অধ্যায়। এই চিঠি রক্ষিত হয় নাই; তবে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ পিতার নিকট হইতে যে-সকল চিঠি পাইয়াছিলেন তাহার অনেকগুলি তিনি রক্ষা করেন, বর্তমানে সেগুলি বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহ-ভুক্ত। এগুলি এই বিভাগে মুদ্রিত হইল।

মুদ্রিত প্রথম চিঠিখানি পাওয়া যায় নাই, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সংকলিত মহর্ষির 'পত্রাবলী' হইতে গৃহীত। অপরগুলি বিশ্বভারতী-রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত আছে।

আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রূপে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক প্রধান আচার্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি চিঠি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (পৌষ ১৮০৮ শক) মুদ্রিত হইয়াছিল, পরে জীবনস্মৃতির গ্রন্থপরিচয়ে উদ্ধৃত হয়; এই চিঠিটিও এই বিভাগে মুদ্রিত হইল। ইহা ছাড়া মহর্ষিকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অপর কোনো চিঠির সন্ধান পাওয়া যায় নাই; কেবল মুদ্রিত প্রথম চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত একটি বাক্য উদ্ধৃত আছে।

১

ওঁ

প্রাণাধিক রবি—

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির করিয়াছ এবং লিখিয়াছ যে আমি 'বারিষ্টার হইব'। তোমার এই কথার উপরে এবং তোমার শুভ বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া তোমাকে ইংলণ্ডে যাইতে অনুমতি দিলাম। তুমি সৎপথে থাকিয়া কৃতকার্য্য হইয়া দেশেতে যথা সময়ে ফিরিয়া আসিবে, এই আশা অবলম্বন করিয়া থাকিলাম। সত্যেন্দ্র পাঠাবস্থাতে যত দিন ইংলণ্ডে ছিলেন, ততদিন ··· টাকা করিয়া প্রতিমাসে পাইতেন। তোমার জন্য মাসে ··· টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম। ইহাতে যত পাউণ্ড হয় তাহাতেই তথাকার তোমার যাবদীয় খরচ নির্ব্বাহ করিয়া লইবে। বারে প্রবেশের ফী এবং বার্ষিক চেম্বার ফী আবশ্যক মতে পাইবে। তুমি এবার ইংলণ্ডে গেলে প্রতিমাসে ন্যূনকল্পে একখানা করিয়া আমাকে পত্র লিখিবে। তোমার থাকার জন্য ও পড়ার জন্য সেখানে যাইয়া যেমন যেমন ব্যবস্থা করিবে তাহার বিবরণ আমাকে লিখিবে। গতবারে সত্যেন্দ্র তোমার সঙ্গে ছিলেন, এবার মনে করিবে আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমার স্নেহ জানিবে। ইতি ৮ ভাদ্র ৫১[১]।

[১২৮৭ বঙ্গাব্দ ॥ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ]

২

ওঁ

প্রাণাধিক রবি

তুমি অবিলম্বে এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

---

১ ব্রাহ্মসম্বৎ

অনেকদিন পরে তোমাকে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিবে। তুমি সঙ্গে একটা বিছানা এবং একটা কম্বল আনিবে। তুমি এই পত্র জ্যোতিকে দেখাইয়া সরকারি তহবিল হইতে এখানে আসিবার ব্যয় লইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ির **Return Ticket** লইবে। আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২২ ভাদ্র ৫৪ [১২৯০॥১৮৮৩]

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

মসূরী

৩

ওঁ

প্রাণাধিক রবি

কারবার[১] হইতে নির্ব্বিঘ্নে বাটিতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে যে পত্র লিখিয়াছ, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এইক্ষণে তুমি জমীদারির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমাওয়াশিল বাকী ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতিসপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্তমতে তোমাকে আমি উপদেশ এবং তোমার কার্য্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিব। না জানিয়া শুনিয়া এবং কার্য্যের গতি বিশেষ অবগত না হইয়া কেবল মফঃস্বলে বসিয়া থাকিলে কিছুই উপকার হইবে না।

আমার স্থানপরিবর্ত্তনে শরীরের কিছুই উপকার বোধ হইতেছে না। সকল উপায়ই ব্যর্থ হইতেছে। আমার এই জীর্ণ শরীরে সুস্থতার আর

১ কারোয়ার

আশা নাই। ঈশ্বর তোমাকে কুশলে কুশলে রক্ষা করুন এই আমার স্নেহের আশীর্ব্বাদ। ইতি ২২ অগ্রহায়ণ ৫৪ [১২৯০ ॥ ১৮৮৩]

দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

বক্ষার[১]

৪

ওঁ

চুঁচুড়া

৭ ফাল্গুন ৫৪

[১২৯০ ॥ ১৮৮৪]

প্রাণাধিক রবি

ইংরাজি শিক্ষার জন্য ছোটবৌ[২]কে লারেটো হৌসে পাঠাইয়া দিবে। ক্লাসে অন্যান্য ছাত্রীদিগের সহিত একত্র না পড়িয়া তাহার স্বতন্ত্র শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত উত্তম হইয়াছে। তাহার স্কুলে যাইবার কাপড় ও স্কুলের মাসিক বেতন ১৫ টাকা সরকারী হইতে খরচ পড়িবে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অনেক ভুল হয়—বিদ্যারত্নকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিবে। "হাতে লয়ে দীপ অগণন" আবার চৈত্র মাসের পত্রিকাতে তাহা ছাপাইয়া তাহার অসম্পূর্ণতা দোষ পরিহার করিবে। হিমালয়েও আমার স্বাস্থ্য নাই, এই গ্রীষ্মালয়েও আমার স্বাস্থ্য নাই; আমার স্বাস্থ্য ইহার সেই অতীত স্থানে, যেখান হইতে রবি ও শশী প্রভা ও সুধা লাভ করে। আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

---

১ বক্সার

২ রবীন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী মৃণালিনী দেবী। বিবাহ ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০

৫

ওঁ

চুঁচুড়া
১৮ ভাদ্র ৫৫
[১২৯১ ॥ ১৮৮৪]

প্রাণাধিক রবি

এই শনিবারের মধ্যে একদিন এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে আমি অতীব আনন্দিত হইব। যেদিন তুমি এইখানে আসিবে, সেই দিনে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কহিবে— আমার স্নেহ জানিবে। ইতি—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

৬

ওঁ

চুঁচুড়া
৬ আশ্বিন ৫৫
[১২৯১ ॥ ১৮৮৪]

প্রাণাধিক রবি

কৈলাশচন্দ্র সিংহের বেতন আমার নিজ তহবিল হইতে দিতে শ্রীযদুনাথ চাটুয্যাকে অনুমতি করিলাম।

যদি সমাজে একজন গায়ক রাখিতে ২৫৲ টাকা মাসে মাসে বেতন লাগে তাহা সমাজ হইতেই পড়িবে। যেহেতু এ সমাজের নির্দ্দিষ্ট ব্যয়ের মধ্যে গণ্য। আমার স্নেহ জানিবে। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

৭

ওঁ

চুঁচুড়া
২০ আশ্বিন ৫৫
[১২৯১ ॥ ১৮৮৪]

প্রাণাধিক রবি

আমি তোমার পত্র পড়িয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম যে তোমার শরীর অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, মাথার মধ্যে এক প্রকার কষ্ট ও বুক "ধড় ধড়" করে। তুমি একেবারে পুষ্টিকর আহার ছাড়িয়া দিয়াছ। তাহার জন্যই তোমার এই দুর্ব্বলতা ও পীড়া। মৎস্য মাংস আহার না করিলে তোমার শরীর পুষ্ট হইবে না। তুমি নীলমাধব ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ বিষয়ে যাহা বিধান পাও, তদনুসারে চল, এই আমার পরামর্শ ও উপদেশ। রামমোহন রায় আমাকে বলিতেন যে তুমি মাংস খাওনা ভাল নয়,— চারাগাছে জল না দিলে সে কি সতেজ গাছ হয় ?

আমার হৃদয়ে একটি বড় ব্যথা লাগিয়াছে— শ্রীকণ্ঠ বাবু আর এ লোকে নাই— তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বিধবা কন্যার পত্রে এই সংবাদ কল্য অবগত হইলাম। তাঁহার কন্যা আমাকে লিখিয়াছেন যে "কি মধুর তব করুণা" গাইতে গাইতে একেবারে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দিলেন। "হে৷ ত্রিভুবননাথ" তাঁহার এই গানটি আমার হৃদয়ে মুদ্রিত রহিল এবং এই গানটি তাঁহার সম্বল হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল। আমার হৃদগত স্নেহ গ্রহণ করিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

৮

ওঁ

৮ পৌষ ৫৫

[১২৯১ ॥ ১৮৮৪]

প্রাণাধিক রবি

একটি ভাল হারমোনিয়াম ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ— শাস্ত্রীর নিকট হইতে শুনিলাম— অতএব তাহা ক্রয় করিবে। কিন্তু যে হারমোনিয়াম মেরামত করিতে দিয়াছ, তাহা তবে কি উপকারে আসিবে?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

চুঁচুড়া

৯

ওঁ

চুঁচুড়া

৯ আষাঢ় ৫৬

[১২৯২ ॥ ১৮৮৫]

প্রাণাধিক রবীন্দ্রনাথ

বিষ্ণুর পেন্‌সন যেমন সমাজে পড়িয়া আসিতেছে, সেই প্রকার পড়িতে থাকিবে। আশুতোষের হৃদয়ে মঙ্গলময়ের আভা পড়িয়াছে— তিনিই তাহাকে এই সংসারের বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন। আমাদের তাহাকে সাহায্য করিবার কিছুই ক্ষমতা দেখিতেছি না। সালিথার জায়গা ও বাগান সৌদামিনীর নিজ নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবার জন্য দ্বিপেন্দ্রকে উপদেশ করিলাম। আমার স্নেহ জানিবে। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

১০

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহোদয়

শ্রীচরণেষু।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন নিকটস্থ হইয়াছে—এ উপলক্ষে সমাজ বাটীর ত্রিতল গৃহে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু গৃহটি জীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া সমাজের অধ্যক্ষ ট্রষ্টী মহাশয়েরা ইহাতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া আমাদিগকে সাবধান হইবার জন্য এক পত্র লিখিয়াছেন এবং আগামী ১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উৎসব কার্য্য অন্য কোন স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া তথায় সমাধা করিতে বলিয়াছেন। অতএব এক্ষণে আপনকার নিকট আমারদের এই প্রার্থনা যে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের উক্ত কার্য্য সমাধা করিবার জন্য একটী স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া কৃতার্থ করুন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২৫ অগ্রহায়ণ
ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৭ কলিকাতা
[১২৯৩ ॥ ১৮৮৬]

সেবক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক

স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আদি ব্রাহ্ম-সমাজের

সম্পাদক সমীপেষু।

তোমার ২৫ অগ্রহায়ণের পত্র আমি প্রাপ্ত হইলাম। আগামী ১১ মাঘের প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা কার্য্য সমাধা করিবার জন্য একটি

স্থান নির্ণয় করিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছ। অতএব আমার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে তদুপযোগী স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিলাম। সেই স্থানে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা সুসম্পন্ন হইয়া গেলে আমি আহ্লাদিত হইব। ইতি ২৬ অগ্রহায়ণ ৫৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ। [১২৯৩ ॥ ১৮৮৬]

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রধান আচার্য্য

প্রকাশসূচী

প্রবেশক — তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। আষাঢ় ১৮২৬ শক
নৈবেদ্য ১৬

জন্মদিনে ও মৃত্যুদিনে কথিত/পঠিত

১ 'মহর্ষির জন্মোৎসব'। ভারতী। আষাঢ় ১৩১১
অপিচ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। শ্রাবণ ১৮২৬ শক
'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', চারিত্রপূজা

২ 'মহর্ষির লোকান্তর গমন'। ভারতী। ফাল্গুন ১৩১১

৩ 'প্রার্থনা'। বঙ্গদর্শন। ফাল্গুন ১৩১১
অপিচ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ফাল্গুন ১৮২৬ শক।
চারিত্রপূজা

৪ 'মহাপুরুষ'। বঙ্গদর্শন। মাঘ ১৩১৩
অপিচ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ফাল্গুন ১৮২৮ শক
চারিত্রপূজা

৫ 'মৃত্যুর প্রকাশ'। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ফাল্গুন ১৮৩০ শক
শান্তিনিকেতন। প্রথম খণ্ড

৬ 'মন্দির'। শান্তিনিকেতন পত্রিকা। বৈশাখ ১৩২৯

৭ 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর'। প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৪২
চারিত্রপূজা

প্রকাশসূচী

৭ই পৌষ

১ 'দীক্ষা'

শান্তিনিকেতন। প্রথম খণ্ড

২ 'ভক্ত'

শান্তিনিকেতন। দ্বিতীয় খণ্ড

৩ 'সামঞ্জস্য'। ভারতী। মাঘ ১৩১৭

অপিচ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ফাল্গুন ১৮৩২ শক

শান্তিনিকেতন। দ্বিতীয় খণ্ড

৪ 'মুক্তির দীক্ষা'। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। মাঘ ১৮৩৫ শক

শান্তিনিকেতন। দ্বিতীয় খণ্ড

৫ 'দীক্ষার দিন'। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। মাঘ ১৮৩৬ শক

শান্তিনিকেতন। দ্বিতীয় খণ্ড

৬ '৭ই পৌষ প্রাতে মন্দির'। শান্তিনিকেতন পত্রিকা।

ফাল্গুন ১৩২৬

৭ 'দীক্ষা'। শান্তিনিকেতন পত্রিকা। ফাল্গুন ১৩২৮

৮ '৭ই পৌষ ১৩২৯'। শান্তিনিকেতন পত্রিকা। পৌষ ১৩২৯

জীবনস্মৃতি

১ 'পিতৃদেব'

২ 'হিমালয়যাত্রা'

৩ 'স্বাদেশিকতা'

৪ স্বাদেশিকতা : খসড়া পাণ্ডুলিপি

পিতৃস্মৃতি

১-২ প্রবাসী। ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৮

৩ প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

প্রকাশসূচী

মহর্ষি-প্রসঙ্গ

১ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্র। চিঠিপত্র ৮, পত্র ৬১

২ অনঙ্গমোহন রায়কে লিখিত পত্র। ২৮ আষাঢ় ১৩১৬
'সুন্দরম্'। প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

৩ 'অগ্রসর হওয়ার আহ্বান'। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। মাঘ ১৮৩৫ শক
শান্তিনিকেতন। দ্বিতীয় খণ্ড

৪ 'শিবনাথ শাস্ত্রী'। প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩২৬

৫ '৭ই পৌষ'। শান্তিনিকেতন পত্রিকা। ফাল্গুন ১৩২৬
অপিচ 'জীবন-উৎসব'। বিচিত্রা। মাঘ ১৩৩৭

৬ '৭ই পৌষ উদ্বোধন'। শান্তিনিকেতন পত্রিকা। মাঘ ১৩৩০

৭ শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র। ৭ ডিসেম্বর ১৯২৬
'দেশ'। ২৬ কার্তিক ১৩৬৭

৮ 'বৃহত্তর ভারত'। প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৪
কালান্তর। পৃ ৩০১

৯ 'দীক্ষা'। প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৩৫

১০ 'মানবসত্য'
মানুষের ধর্ম। পরিশিষ্ট

১১ 'পারস্য ভ্রমণ'। বিচিত্রা। আশ্বিন ১৩৩৯
অপিচ পারস্য-যাত্রী। বর্জিত রচনাংশ পৃ ১০৯

১২ 'যাত্রীমানব'। প্রবাসী। মাঘ ১৩৪২
শান্তিনিকেতনে বার্ষিক উৎসবে আচার্যের উপদেশ।

১৩ 'মাঘোৎসব'। প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৪৩
শান্তিনিকেতনে মাঘোৎসবে আচার্যের উদ্‌বোধন ও উপদেশ।

প্রকাশসূচী

১৪ ‘৭ই পৌষ’। প্রবাসী। মাঘ ১৩৪৩
শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ উৎসবের উদ্‌বোধন ও উপদেশ।

চিঠিপত্র

১ পত্রাবলী। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২-৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা। মাঘ-চৈত্র ১৩৫০

১০ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। পৌষ ১৮০৮ শক

জন্মদিনে ও মৃত্যুদিনে কথিত / পঠিত অধ্যায়ের ৭-সংখ্যক রচনা শ্রীক্ষিতীশ রায় -কর্তৃক এবং মহর্ষি-প্রসঙ্গ অধ্যায়ের ১২ ১৩ ও ১৪ -সংখ্যক রচনা যথাক্রমে শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীক্ষিতীশ রায় ও শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত -কর্তৃক অনুলিখিত।

সংশোধন

পৃ ৫০। ১৩১৩ স্থলে ১৩১৫ হইবে।

পৃ ১২৮। সর্বশেষে যোগ হইবে—

৪-সংখ্যক রচনাংশ জীবনস্মৃতি খসড়া পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।

পৃ ১৭৯। সম্মুখস্থ চিত্রের বিবরণ—

'মহর্ষির আত্মজীবনীর রবীন্দ্রনাথ-লিখিত খসড়া' স্থলে 'মহর্ষির আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপির খাতায় মহর্ষির নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত টীকা' হইবে।

পৃ ১৯৪। ছত্র ৯। 'অপরগুলি' স্থলে '২-৮ সংখ্যক পত্র' হইবে।

পৃ ১৯৬। পত্র ৩, ছত্র ৭। 'উপদেশ' স্থলে 'উপদেশ দিব' হইবে।

পৃ ১৯৭। পত্র ৩, শেষ ছত্র। 'দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ' স্থলে 'শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ' হইবে।

স্বীকৃতি

এই গ্রন্থ সংকলনে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন। শ্রীকানাই সামন্তের পরামর্শেও সংকলয়িতা উপকৃত হইয়াছেন।

'গীতাঞ্জলি'-পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাটি শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের সৌজন্যে মুদ্রিত হইল।

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মহর্ষির একটি প্রতিকৃতি (প্রচ্ছদ ও পৃ ১১২) অবনীন্দ্রনাথের পুত্রগণের সংগ্রহভুক্ত ও তাঁহাদের সৌজন্যে মুদ্রিত, অপরাপর প্রতিকৃতি এবং পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতী-রবীন্দ্র-ভবনের সংগ্রহভুক্ত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, গ্রন্থভুক্ত সকল চিত্রই বহুবর্ণ। প্রথম চিত্রটি মহর্ষির অশীতিবর্ষ-পূর্তি-দিবসে এবং পরবর্তী দুইটি চিত্র আনুমানিক ১৮ ও ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অঙ্কিত।

মূল্য ৬'৫০ টাকা